এখন ডুয়ার্স

১৫ জানুয়ারি ২০১৬। ১২ টাকা

নিঃশব্দ বিপ্লব ডুয়ার্সে
টোটো কোম্পানি

কেন্দ্রীয় মন্ত্রির দাওয়াই
চা বাগান সমস্যায় কতটা কার্যকরী হবে?

জোটে গিয়ে দলের বড় ঘাঁটি উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের লাভ কতটুকু?

ভূমিকম্পে জেরবার নগর ডুয়ার্স কি একদিন নিকেশ হয়ে যাবে?

নতুন দুই ধারাবাহিক
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি। লাল চন্দন নীল ছবি

এখন থেকে পাক্ষিক

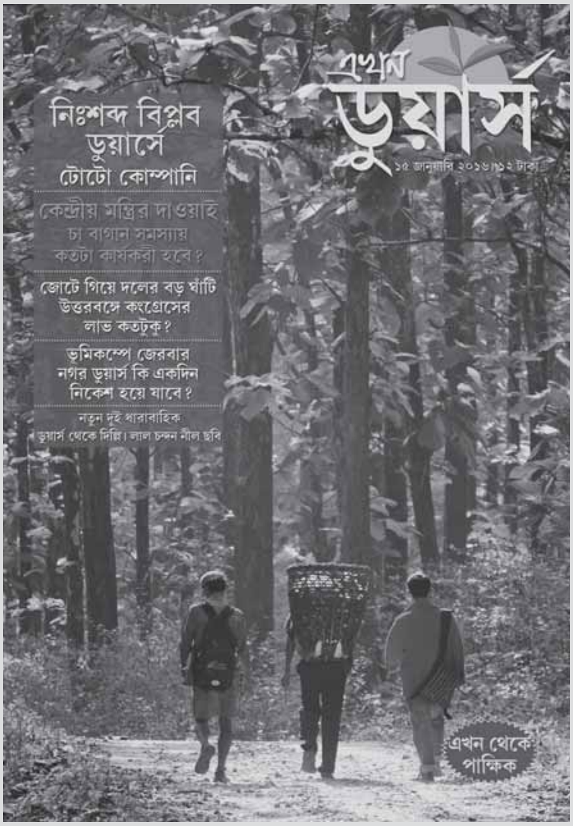

শীতের টানে আজো আমি নদীর কাছে যাই
শুকনো বালু চেঁচিয়ে বলে— নাই সে নদী নাই!
নদীর বুকে কষ্ট জমে, তেষ্টা পেল তারও
'এমন করে বাঁচার চেয়ে এক্কেবারে মারো!'

কাঁদছে ডিমা কাঁদছে নোনাই শুকনো জলের রেখা
চেপ্টি পুঁটি দাঁড়কা বোয়াল... আর পাবো না দেখা?
রূপোর মতো বোরোলি মাছ হারিয়ে যাবে শেষে?
বনের ঝোরা দিঘল জলা ক্রমেই নিরুদ্দেশে!

সেই পাখিরা নেই ক্রমশ, স্তব্ধ তাদের ডানা
আর কতকাল সইবে ওরা নিত্যদিনের হানা!
শখশিকারীর লেন্সবিলাসে রঙের কারিগরী
গাছ বলেছে— আমরা তবু রোজ এখানে মরি!

ডাল কেটে নেয় ঘরের মানুষ, বাগানগেটে তালা
ডুয়ার্স তবু পথ পেতে দেয়, গোপন রেখে জ্বালা!
হাইওয়েতে হাঁটছে হাতি, রেল পিষে দেয় তাকে
তবু কেমন হ্যাংলা ডুয়ার্স আপন করেই ডাকে!

ছন্দে অমিত কুমার দে
ছবিতে সৌরভ শিকদার

এখন ডুয়ার্স পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর দায়িত্ব পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়। যে কোনও প্রকার আইনি ব্যবস্থা কলকাতা এলাকার মধ্যে হতে হবে।

এই সংখ্যায় বেশ কিছু ছবি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় বর্ষ, ১০/২ সংখ্যা, ১৫ জানুয়ারি ২০১৬

এই সংখ্যায়

এখন ডুয়ার্স
নিঃশব্দ বিপ্লব ডুয়ার্সে ১২

চায়ের কাপে চোখের জল
বিশ্ববাজারে চায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে মালিক-ব্রোকার আঁতাঁত ১৬
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাওয়াইয়ে চা-বাগানের অসুখ সারবে কি? ২০

রাজনীতির ডুয়ার্স
বাম-কংগ্রেস জোট হলে উত্তরবঙ্গে অস্বস্তিতে পড়বে তৃণমূল? ২৪

দুরবিন
জোটে গিয়ে এ রাজ্যের কংগ্রেসের লাভ কতটুকু? ২৫

ডাকে ডুয়ার্স
বৃক্ষনিধন আর বনভোজনে প্রাণান্ত পক্ষীকুলের ৪

পাঠকের ডুয়ার্স
বিপন্ন আমাদের নদী-জঙ্গল-জলা, বিপন্ন আমরা ৬
তরাইয়ের আনারস শিল্পও ভোগে যাবে? ৮

স্পেশাল ডুয়ার্স
ভূমিকম্পে জেরবার নগর ডুয়ার্স কি একদিন নিকেশ হয়ে যাবে? ১০

নিয়মিত বিভাগ
ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স ১১
খুচরো ডুয়ার্স ২৬
সংঘ সংস্কৃতির ডুয়ার্স ২৮
ডুয়ার্সের মুখ ২৯
প্রহেলিকা ৩৬

ধারাবাহিক ডুয়ার্স
ছিটমহলের ছেঁড়া-কথা ২২
ডুয়ার্স থেকে দিল্লি ৩০
তরাই উৎরাই ৩২
লাল চন্দন নীল ছবি ৩৭

বিদ্যার্থীর ডুয়ার্স
আপনার ছেলে বা মেয়ে কি এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে? ২৭

ডুয়ার্সের গল্প
অস্ত্রপাচার ৩৪

পর্যটনের ডুয়ার্স
বনভোজনের নতুন ঠিকানা চেল লাইন ৪০

শ্রীমতী ডুয়ার্স
নিজের বিয়েতে নিজেই সাজুন ৪১
শিশু দত্তক নেওয়ার আইনকানুন ৪২
নেট ছাড়াই ফেসবুক ৪৩
ডুয়ার্সের ডিশ ৪৪
শীতে নবজাতকের যত্ন ৪৬
পরশখানি দিয়ো ৪৭

সম্পাদক প্রদোষ রঞ্জন সাহা ও অমিত কুমার দে
কার্যনির্বাহী সম্পাদক তপন মল্লিক চৌধুরী
ডুয়ার্সের ব্যুরো প্রধান শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
অলংকরণ দেবাশিস রায়চৌধুরী
সার্কুলেশন দেবজ্যোতি কর, দিলীপ বড়ুয়া
বিজ্ঞাপন সেলস সুরজিৎ সাহা
বিপণন দপ্তর বিস্তার মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ৮৩/৬ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৯, **ইমেল** ekhonduars@yahoo.com
মুদ্রণ অ্যালবাট্রস, **প্রকাশনা** প্রদোষ রঞ্জন সাহা

ডুয়ার্সে আমাদের নতুন অফিস
মুক্তা ভবনের দোতলায়। মার্চেন্ট রোড। জলপাইগুড়ি

প্রকৃতির কোলে উন্নয়নের পথে

রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত, নামেই গ্রাম আসলে সম্পূর্ণ চা বাগান অধ্যুষিত, অন্তহীন সবুজে মোড়া এক স্বপ্নের ভূখণ্ড। যেখানে গরুবাথান পাহাড় থেকে উড়ে আসা মেঘের দল বৃষ্টি হয়ে ভিজিয়ে দেয় চায়ের বাগ। অসংখ্য পাহাড়ি ঝোড়া একদল নর্তকীর মতো ছন্দে ছন্দে মাতোয়ারা হয়ে বয়ে যায় উত্তর থেকে দক্ষিণে। আবার কখনও রাতের অন্ধকারে শ্রমিক মহল্লা থেকে ভেসে আসা মাদল আর নাগরার শব্দে এবং আদিবাসী সংগীতের মূর্ছণায় সৃষ্টি হওয়া সুরের জাল সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েত কে মোহিত করে তোলে। তখন সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা ভুলে প্রকৃতির কোলে নিজেকে সমর্পণ করে রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত।

প্রকৃতির অকৃপণ দানে সৃষ্টি হওয়া পশ্চিম ডুয়ার্সের মালবাজার শহর সংলগ্ন ১৪১৩৫.৫ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট এই গ্রাম পঞ্চায়েতের মোট সদস্য সংখ্যা ২২ জন। ১৯৯৮ সালে যখন চা-বাগান এলাকা ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অর্ন্তভুক্ত হয় তখনই রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্ম। আর জন্মলগ্ন থেকেই এই গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষ্য ছিল চা-বাগানের নন-ওয়ার্কার পরিবারসমূহের জন্য যত বেশি সম্ভব শ্রমদিবস সৃষ্টি করা। সেই সঙ্গে স্থায়ী সম্পদ তৈরি করার দিকেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। তাই একদিকে যখন হাজার হাজার শ্রমদিবস তৈরি করে আশি শতাংশ তপশিলী জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত এই গ্রাম পঞ্চায়েতের গরিব পরিবারগুলোর মুখে হাসি ফোটানোর কাজ চলেছে তখন অন্যদিকে একের পর এক পাকা নালা, কালভার্ট, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, আই.সি.ডি.এস কেন্দ্র, ভাঙন প্রতিরোধে তারজালি বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণের দ্বারা স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত রূপায়িত হয়েছে এক শক্তিশালী গ্রাম পঞ্চায়েতে।

সেই পরিবর্তনের ধারাকে অব্যাহত রাখতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে এই গ্রাম পঞ্চায়েত। আর তাই মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পের শ্রমদিবস তৈরি ও মোট অর্থ খরচের নিরিখে বর্তমানে সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলায় রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থান প্রথম।

এবছর রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অগ্রাধিকারের তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে 'স্বচ্ছ ভারত মিশন'এর অর্ন্তগত 'মিশন নির্মল বাংলা' প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ। সেই লক্ষ্যে এখনও পর্যন্ত ১২০০ শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এরই সঙ্গে রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে গড়ে তুলতে MGNREGS প্রকল্পের অর্ন্তগত ব্যক্তিগত উপকারদায়ী প্রকল্প (IBS)-এর মাধ্যমে সমগ্র গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন করবার কাজ জোর কদমে চলছে।

নাগেশ্বর পাশোয়ান
প্রধান, রাঙ্গামাটি গ্রাঃ পঃ

মারোয়ারি ওরাও
উপ-প্রধান, রাঙ্গামাটি গ্রাঃ পঃ

রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েত

বৃক্ষনিধন আর বনভোজনে প্রাণান্ত পক্ষীকুলের

বেশ কয়েক বছর আগে হাসিমারা এয়ারবেসে সাংবাদিকদের সামনে একটি নতুন বিমান-বিধ্বংসী আধুনিক প্রযুক্তির বিবরণ দিতে গিয়ে বায়ুসেনার একজন উচ্চপদস্থ কর্মী আক্ষেপ করে বলেছিলেন, দেখুন, চিন যদি আমাদের আক্রমণ করে তাহলে প্রতিরোধক ব্যবস্থা নিতে আমরা সময় পাই মাত্র সাড়ে তিন মিনিট। অথচ সে সময় আমাদের ঝটিতি বিমান ওঠানামায় সবচেয়ে বিপজ্জনক বাধা হয়ে দাঁড়ায় আশপাশের জঙ্গল থেকে উড়তে থাকা সব 'চিড়িয়া'। কিন্তু দেশরক্ষায় ব্রতী সেই সেনাধ্যক্ষটি বিলক্ষণ জানেন, পৃথিবী রক্ষার জন্য সেইসব 'চিড়িয়া' কতটা জরুরি। তাই পক্ষীকুলের হাজার 'উপদ্রব' সত্ত্বেও এয়ারবেসের আশপাশের জঙ্গল 'অটুট' রয়ে গিয়েছে।

অথচ এই মুহূর্তে ডুয়ার্সে মানুষ বা হাতির চাইতেও অনেক বেশি বিপন্ন সেই পক্ষীকুল। গোটা ডুয়ার্স জুড়ে চলছে রাস্তা চওড়া করার কাজ আর তার আগে আগে চলেছে বৃক্ষনিধন যজ্ঞ। বড় বড় পুরনো গাছ কাটা পড়ছে শয়ে শয়ে। আর গৃহহারা হচ্ছে হাজারে হাজারে পাখি। একে জঙ্গল জুড়ে বনভোজনের দৌরাত্ম্যে ছানাপোনা নিয়ে দিশাহারা হতে হচ্ছে, দূরে উড়ে যেতে হচ্ছে শান্তির খোঁজে, তার উপর গাছ কাটায় বিপত্তি আরও বেড়েই চলেছে তাদের। কেবল স্থানীয় পাখিরাই নয়, এতে বিমুখ হচ্ছে লাখে লাখে পরিযায়ী পাখির দল। পরিবেশের ভারসাম্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে বলে কিছু মানুষ আর বিজ্ঞানী-বিশেষজ্ঞ অবশ্য সরব হয়েছেন। পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানসিক ভারসাম্যেও যে বিচ্যুতি ঘটেছে তা হলফ করেই বলা যায়।

তবে এর দায় মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ, যাঁরা আইন-শাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে আছেন, কেবল তাঁদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে নিস্তার পাওয়া যাবে না— এ আমাদের প্রজন্মের ভুল। যারা ছোটবেলায় গুলতি দিয়ে পাখি মারতে শিখেছিল, যারা সাবালক হয়ে পায়রা-ঘুঘু-বনমুরগি মেরে রেঁধে চড়ুইভাতি করত, তারাই তো এখন বড় হয়ে জঙ্গল কেটে স্মার্ট সিটি গড়ছে, গাছ কেটে সিক্স লেন রাস্তা বানাচ্ছে। তারা তাদের ছেলেমেয়েদের কীভাবে শেখাবে যে, গাছ লাগালে পাখি আসে আর তার সঙ্গে মেলে বুকভরা খাঁটি অক্সিজেন? এ তো আমাদের আশা করাই অন্যায়, তা-ই না?

বনভোজন রুখতে লোকবল নয় চাই কৌশল

কেবল পাখিই নয়, একই দুর্ভোগ জুটছে বনের অন্য বাসিন্দাদের। মালদার আদিনার একটি হরিণ দেহত্যাগ করেছে দিনকয়েক হল। তাঁকে মৃত অবস্থায় পেয়ে বন বিভাগ ময়নাতদন্তের পর শেষকৃত্যও সম্পন্ন করেছে। কিন্তু তদন্তের রিপোর্টে কী মিলল? এ নিয়ে অবশ্যি বন বিভাগ স্পিকটি নট। হরিণের ডেরায় চড়ুইভাতি করতে আসা দলবল এমন জোর মাইক বাজিয়েছে যে, বেচারা হরিণের পিলে গিয়েছে চমকে আর সেই শক-এই হার্ট ফেল! ওই তল্লাটে পিকনিকে আসা দলবলেরা নাকি পয়সা দিয়ে মাইক আর ডিজে ভাড়া করে আনে বলে তা উশুলের জন্য তারস্বরে সেসব বাজাতে থাকে। এটাই নিয়ম। বেচারা হরিণের দেহত্যাগের আসল কারণ হল সেই প্রাণঘাতী অসভ্য ডিজে-ধ্বনি!

চড়ুইভাতির মরশুমে ডুয়ার্সের পাহাড়ি নদী আর জঙ্গলের ধারে-কাছে মনোরম পরিবেশে বনভোজনের দৌরাত্ম্য এমন জায়গায় পৌঁছয় যে ইকোলজিকাল ভারসাম্য রীতিমত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বছরের পর বছর ওই দৌরাত্ম্যের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। মানুষের চিৎকার চেঁচামেচি ছাপিয়ে বাজতে

থাকে ভারি মিউজিক সিস্টেম। তার কম্পাংকে সন্ত্রস্ত বন্যপ্রাণ ও পাখি জঙ্গলের গভীরতম এলাকায় পালিয়ে গিয়েও নিস্তার পায় না। এমনিতে সারা বছরই যা অত্যাচার চলে, শীতের মরশুমে তা চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছায়। অথচ বনদপ্তরের নাকি এব্যাপারে কিছুই করবার নেই। প্রশ্ন জাগে জঙ্গল চত্বরে এই সব বনভোজন ঠেকানোর কোনও আইনকানুন কি বনদপ্তরের নেই? অনুমতিহীন বনভোজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কোনও নিয়মই কি নেই? বিশ্বাস হয় না। চোরাশিকার রোধে ব্যর্থ বনদপ্তর অজুহাত দেখায় লোকবল বড্ড কম। বনভোজন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও তারা নিশ্চয়ই একই অজুহাত দেবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল

পঁচিশ বছর ধরে
আপনার স্বপ্নকে সবুজ করে তোলার
প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আমরা
এই দীর্ঘ চলার পথে যাঁরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে
দিয়েছেন আমাদের দিকে, তাঁদের সবাইকে আমাদের
আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।
সবুজ স্বপ্ন
এস এন রোড, কোচবিহার
ফোন ০৩৫২-২২৩৩৫৬, ২২৩৪৬২

লোকবলের অভাব থাকলেও পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য তো তারা সব সময়ই নিতে পারেন। কিন্তু তারও তো কোনও দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত নজরে পড়েনি।

বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকার আশপাশে বেশ কিছু পিকনিক স্পটে এমনটাও দেখেছি যেখানে পিকনিক করতে হলে সেখানকার বনবাসিন্দাদের নিয়ে গড়া বনরক্ষা কমিটির কাছে অনুমতি বাবদ টাকা জমা রাখতে হয়। কেবল তাই নয় বনভোজনের শেষে সেই সব স্পটের জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্য টাকাও সেই এন্ট্রি ফি-র সঙ্গে ধরে নেওয়া হয়। ডুয়ার্সের অন্যান্য জঙ্গল চত্বরেও একই ধরনের নিয়মের কড়াকড়ি হয় না কেন, সেটাই আশ্চর্যের। আসল কথা হল সদিচ্ছার বড় অভাব বনকর্তাদের মধ্যে। আসলে জঙ্গল বা বন্যপ্রাণের ক্ষতিতে তো তাদের মাইনে, সুযোগসুবিধে বা প্রমোশনে কোনও ছাপ পড়ে না! তাই এত অনিয়ম, অত্যাচার সহ্য করতে হয় জঙ্গলের পশুপাখিদের।

বনভোজনের মরশুমে মদ্যপদের মধ্যে ডুয়ার্স ও তরাইয়ের এখানে সেখানে জোরদার মারপিট লাগে, ফি বছর দু'-চারটে প্রাণও যায়। এবার দার্জিলিং জেলা পুলিশ তার জন্য এই সময়টায় বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ ঘোষণা করেছিল। তাতে মদ্যপান ও চেঁচামেচি হয়ত খানিকটা কমানো যেতে পারে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। যেমন অবস্থা ছিল তার কোনও উন্নতি চোখে পড়েনি। বিনা অনুমতিতে জঙ্গলসীমানার (ইকো সেনসিটিভ জোনের) মধ্যে কোথাও বনভোজন করলে বড় অঙ্কের স্পট ফাইন বা নিষেধাজ্ঞা চালু না হলে এসব করার কোনও মানে নেই। লোকবল অভাবের অজুহাত দেন বনদপ্তরের কর্তারা, এ ক্ষেত্রে পুলিশ-প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে এই স্পট ফাইন অভিযান সহজেই চালানো যায়।

সবুজ ডুয়ার্সে যে প্রাকৃতিক সংকট ক্রমশই ঘনিয়ে আসছে তা শীতের মরশুমে সকালে ঘুম থেকে উঠে মাইক বাজিয়ে পিকনিক পার্টির যাত্রা শুরু দেখলেই নিশ্চিত হওয়া যায়। বনবাবুদের কি একটা অনুরোধ এই সুযোগে করতে পারি? বনভোজনের দামাল বাহিনীকে ঠেকাতে না পারুন, দপ্তরের পয়সা খানিক খরচ করে স্কুল-কলেজ স্তরে পুজোর পর থেকেই প্রচারের কাজ তো করতেই পারেন। বিনা অনুমতিতে বনে ঢুকে পড়ে চড়ুইভাতি করা যে কতটা বেআইনি এবং দন্ডনীয় অপরাধ— হোর্ডিং ও সিনেমা হলে তা নিয়ে ঠিকঠাক প্রচার করতে পারলে তার ফল অনেকাংশেই মিলবে বলে মনে হয়। এ রাজ্যের বনদপ্তরের এখন যা হাল তাতে বাহুবলের পরিবর্তে মগজাস্ত্রের ব্যবহারের কথা ভাবতে পারেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বা মুখ্য বনপাল সাহেব।

বিপন্ন আমাদের নদী-জঙ্গল-জলা, বিপন্ন আমরা

প্রতিবেশী দেশ ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্যের দ্বার বলে পরিচিত ছিল জলপাইগুড়ি জেলা। অধুনা ওই জেলা ভাগ হয়ে আলিপুরদুয়ার মহকুমা পৃথক জেলা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। অতীতে তিব্বতিদের সঙ্গে যোগাযোগ ও বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য আদানপ্রদানের মূল পথ ছিল জলপাইগুড়ি জেলা। সেই সময় থেকেই ঘন জঙ্গল কেটে জনবসতি আর রাস্তা তৈরি শুরু হয়েছিল। তখন ছিল কুচবিহার-দিনহাটা-ময়নাগুড়ি ও বৈকুণ্ঠপুর রাজপরিবার ঘিরে সংঘবদ্ধ বসতি। তবে এই অঞ্চলের রাজা বা জমিদার প্রাচীনকাল থেকেই এই ভূভাগের প্রাকৃতিক পরিবেশকে রক্ষা করে চলত। তিস্তা-তোর্সাও আপন বেগে বইত। বৈকুণ্ঠপুর, চিলাপাতা, গোরুমারা, জলদাপাড়া জঙ্গলগুলি ছিল নিবিড়। এখন ডুয়ার্সবাসী মাত্রই জানে যে বনভূমি আর আগের মতো নেই। শহরগুলিতে ছিল প্রচুর সংখ্যক পুকুর, যা থেকে পানীয় জল পাওয়া যেত। প্রচুর পাট চাষ হত, সেই পাট পচানোর জন্য প্রচুর জলাভূমি ছিল। প্রাকৃতিক বৈচিত্রে পরিপূর্ণ ওই জলাভূমিগুলো আজ আর নেই বললেই চলে।

পরিবেশ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইংরেজরা যখন ভারতবাসীদের মধ্যে চায়ের নেশা লাগিয়ে উত্তরবঙ্গ জুড়ে চা-বাগান পত্তন করল, তখন কিন্তু স্থানীয় রাজবংশীরা শ্রমিক হিসেবে যোগদান করেনি। কারণ, তখন তাদের তেমন অভাব ছিল না। ছোটনাগপুর সংলগ্ন এলাকা থেকে আদিবাসী শ্রমিক নিয়ে আসা হয়। অনেক মানুষের বসতির জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। তা ছাড়া প্রচুর নেপালি অধিবাসীও রুজি-রোজগারের জন্য এখানে এসে বনভূমি পরিষ্কার করে বসতি স্থাপন করে, এখনও করছে। জলপাইগুড়ির উত্তর দিক, যেমন— মাদারিহাট, হাসিমারা, বীরপাড়া, কালচিনি, জয়গাঁ, নেপালি অধ্যুষিত বসতি এলাকা, যা কিনা ২০০-২৫০ বছরের বেশি পুরনো নয়। আলিপুরদুয়ার জেলার অন্যতম স্থান পলাশবাড়িতে এক সময় হাজার হাজার পলাশ গাছ শোভা পেত। এখন হাতে গোনা ৪-৫টি পলাশ গাছ নিয়ে ওই অঞ্চল অতি ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা। এর পাশেই রয়েছে পশ্চিম খয়েরবাড়ি, চোরাকারবারিদের স্বর্গরাজ্য। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, খয়েরবাড়ি থেকে কীভাবে রাতের বেলা গাছ কাটা হয়। দিনের বেলা একদল অসাধু লোক গোরুর পাল নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে, গোরু চরানোর নামে তাদের সঙ্গে থাকে ভোজালি। এই ভোজালি দিয়ে তারা গাছের গোড়ার জঙ্গল পরিষ্কার করে সন্ধেবেলা ফিরে চলে আসে। আর রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে করাত নিয়ে ঢোকে আর একদল, তারা ৫-৬ ঘণ্টার মধ্যে গাছ কেটে করাতকলে পাচার করে দেয়।

বনভূমি ধ্বংস হওয়ার আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, ডুয়ার্সের জনসংখ্যার প্রধান অংশ শিক্ষিত নয়। তেমন অর্থনৈতিক কাজও নেই তাদের, ফলে তারা প্রকাশ্যেই বলে, ফরেস্টের গাছ কাটব না তো কী করব? আর এখান থেকেই ফায়দা তুলছে আর-এক শ্রেণির মাফিয়া। তারা এদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বনের পর বন ধ্বংস করছে।

সাল	**মাথাপিছু বনভূমি (হেক্টর)**
১৯০১	০.৬২
১৯৫১	০.৩২
১৯৯১	০.০০৯

দিনের বেলা একদল অসাধু লোক গোরুর পাল নিয়ে জঙ্গলে ঢোকে, গোরু চরানোর নামে তাদের সঙ্গে থাকে ভোজালি। এই ভোজালি দিয়ে তারা গাছের গোড়ার জঙ্গল পরিষ্কার করে সন্ধেবেলা ফিরে চলে আসে। আর রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে করাত নিয়ে ঢোকে আর একদল, তারা ৫-৬ ঘণ্টার মধ্যে গাছ কেটে করাতকলে পাচার করে দেয়।

পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে কিছুদিন আগে পর্যন্ত পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীগুলির খাত থেকে গর্ত করে বোল্ডার তোলা বারণ ছিল। বর্তমানে যে হারে নদী থেকে বালি বা বোল্ডার তোলা হচ্ছে, তার ফলে হড়কা বাণ হওয়ার সম্ভাবনা যেমন বেড়ে যাবে, তেমনি বন্যা সমস্যা প্রকট হবে। এক সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে, হিমালয়, ভুটান ও ডুয়ার্সের বনভূমি ও নদনদীর প্রকৃতি পরিবর্তন হলে নাকি ভারত-বাংলাদেশের যে বিশাল সুন্দর বনাঞ্চল রয়েছে, সেখানেও পরিবর্তন হবে। ডুয়ার্সের ছোট ঝোরা বা নদীগুলি যদি রক্ষা না করা হয় তাহলে জলসংকট গভীরতর হবে। ভুটান সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জলসংকটপূর্ণ এলাকা। বীরপাড়া ব্লকের মাকপা পাড়া গ্রামে জলসংকটের জন্য স্কুলও ছুটি দেওয়া হয়। বন ও জলসংকট মেটাতে কোনও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এই প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষজনদের জন্য নেই। উত্তরবঙ্গের খরস্রোতা নদীগুলি নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি হল, প্রতি বছর বাঁশ দিয়ে সাঁকো বাঁধা আর ফি-বছর হড়কা বান এসে তা ভাসিয়ে নিয়ে বর্ষায় যোগাযোগব্যবস্থা চুলোয় যাওয়া। জলপাইগুড়ি, কোচবিহারের কোনও নদীর উপর যদি কংক্রিটের বাঁধ হয়ও, তা হতে ২০-৪০ বছর সময় লাগবেই— এটা উত্তরবঙ্গবাসীর অভিজ্ঞতা। জলপাইগুড়ি সংলগ্ন অঞ্চলের আর একটা বড় সমস্যা হল, এখানে বৃষ্টিপাতের গড় দিন কমে ২০০ থেকে ১৫৩ দিন হয়ে গিয়েছে, ফলে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বাড়ছে। বৃষ্টির জল মাটির উপর দিয়ে বেশি গড়াচ্ছে, মাটির নিচে জল কম প্রবেশ করছে। ফলে পানীয় জলের সমস্যা বাড়ছে এবং ভূমিক্ষয় বাড়ছে। চা-বাগানের মাটি ধুয়ে চলে যাচ্ছে। কৃষিজমির Top Soil ধুয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে কৃষি উৎপাদন (পাট, তামাক, চা, আনারস) ব্যাহত হচ্ছে। বনভূমি ও জলবায়ুর পরিবর্তন না হলে এইরকম অবশ্য হত না।

ডুয়ার্সের পরিবেশ সমস্যার অন্য আর-একটি দিক হল বন্য প্রাণ নিধন। যে বন ও বন্য প্রাণকে ঘিরে ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্প, তাও ধ্বংসের সম্মুখীন। কুঞ্জনগর ও ফালাকাটায় কচি ঘাসের কারণে হরিণদলের দেখা মিলত, আজ তা আর নেই। ডুয়ার্সের বন্য প্রাণের ঋতুতন্ত্র আজ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। যে জলাশয়কে কেন্দ্র করে পরিযায়ী পাখির দল ডুয়ার্সে আসত, তারও দেখা মেলা ভার। জলাশয়গুলি ভরাটের মুখে। কোচবিহারে জলাশয় ভরাট করে শপিং কমপ্লেক্স গড়া হয়েছে।

ডুয়ার্সের অর্থনীতির একটা বড় অংশ এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আমাদের সকলকে মিলে এই ভয়াবহ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

মনোরঞ্জন ঘোষ, বাদাই টারি, ফালাকাটা

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে কারা?

তিস্তা, মহানন্দা, জলঢাকা, মেচি, বালাসন-সহ মোট ১৭টি নদীর গতিপথ কার্যত বিপন্ন। কোথাও নদীর গতিপথ আটকে বুলেভার্ড তৈরি হয়েছে, আবার কোথাও যথেচ্ছভাবে মাটি ও বালি তুলে নেওয়ায় নদী ধেয়ে যাচ্ছে জনবসতির দিকে। ডিমডিমা ও তিস্তা নদীতে পাথর এবং বোল্ডার তোলা হচ্ছে অবাধে। মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা যাবতীয় আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এই কাজ করে যাচ্ছে আর প্রশাসন হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। গাজলডোবায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তৈরি করা হবে ইকো-টুরিজম হাব। কিন্তু ওই জায়গায় বিশেষ কিছু ছাড়পত্র ছাড়া এরকম হাব তৈরি করাই যায় না। গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের সংরক্ষিত অংশে ছোটখাটো আগুন জ্বালানোও নিষিদ্ধ। অথচ এই পার্কের মধ্যেই রিসর্ট গড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নদীর চরে বালি, পাথর, বোল্ডার তুলে নেওয়ায় শুধু যে তার সৌন্দর্য হারিয়ে যাচ্ছে তা নয়। এই নদী বর্ষায় তার গতিপথ বদল করে জনবসতি এলাকা এবং স্থানীয় চা-বাগানগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেই আশঙ্কাও রয়েছে। মালবাজারের মাল নদীতে ও ধূপগুড়ির গুলমারি নদীতে প্লাস্টিকের ডাঁই, মূর্তি নদীর ধারে চিটফান্ড সংস্থার প্রস্তাবিত রিসর্ট তৈরির অসমাপ্ত নির্মাণের ইট-কাঠ-লোহা ইত্যাদি নদীগুলির গতিপথ রুদ্ধ করছে। এইসব অভিযোগ তথ্যসহ কলকাতা হাই কোর্টের গ্রিন ট্রাইবুনালে মামলা দায়ের করেছেন পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যেমন—

ক) বক্সা টাইগার রিজার্ভের কোর এলাকায় যাবতীয় পরিবেশ আইন ভেঙে নির্মাণকাজ চলছে কার অনুমতি নিয়ে?

খ) ১৯৯০ সালে জয়ন্তি নদীর উপর পুরনো সেতুটির উচ্চতা ছিল ৬ মিটার। এর পর ক্রমশ নদীগর্ভ ভরাট হতে হতে নদীর সঙ্গে সেতুর উচ্চতা কমেছে, কিন্তু সেতুর ওই অংশ এখনও খাড়া রয়েছে। ২০১০-এ সেতুর ওই অংশটি নদীবক্ষের সঙ্গে একই উচ্চতায় চলে আসে। আর এখন শুধুমাত্র সেতুর দু'টি স্তম্ভ বুজে যাওয়া নদীগর্ভের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। ঐতিহ্য রক্ষা বা পরিবেশ রক্ষা দুই-ই বিঘ্নিত।

গ) মেচি নদীর ধারে কলাবাড়ি জঙ্গলের মধ্যে পাথর ভাঙার কারখানা চলছে। এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়েই আবার হাতি পারাপারের করিডর রয়েছে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে অবৈধ কারবারের জন্য হাতি রুট বদল করে বসতি এলাকায় ঢুকে পড়ছে।

ঘ) উত্তরবঙ্গে পর্যটন শিল্প উন্নয়নে রাজ্য সরকার একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে জয়ন্তি নদীর ধারে জঙ্গলের কোর এলাকায় সরকারি উদ্যোগে যুব আবাস, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের বাংলো তৈরি হচ্ছে। কয়েকটি প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। পর্যটনের গন্তব্য হোক, কিন্তু তাতে যেন পরিবেশের ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে কি?

সুনন্দন রায়চৌধুরী, কুমারগ্রাম

প্রকাশিত চিঠি পাঠকের নিজস্ব অভিমত। তার জন্য 'এখন ডুয়ার্স' সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নয়।

মুখ্যমন্ত্রীর নজরে না পড়লে তরাইয়ের আনারস শিল্পও ভোগে যাবে?

ডুয়ার্স-তরাইয়ের চা-বাগান ও শিল্পের পরিস্থিতি আজ যখন করুণতম জায়গায় এসে পৌঁছেছে, আর হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার মতো অবস্থা দাঁড়িয়েছে সরকারের। সে সময় কোনও অজ্ঞাত কারণে চূড়ান্ত অবহেলা চলছে এলাকার দ্বিতীয় অর্থকরী শিল্প আনারস নিয়ে। খবরে বলছে, মাঠে পড়ে রয়েছে ৫০ হাজার মেট্রিক টন আনারস, অথচ ১২ কোটি টাকা ব্যয়ে বছর পাঁচেক আগের তৈরি আনারস উন্নয়নকেন্দ্র ও হিমঘর কেন বন্ধ হয়ে আছে আজও? তার সদুত্তর দেওয়ার কেউ নেই। স্টল বিলি হয়ে গেলেও সেখানে আজও কেউ আসেনি। কেউ বলছে, উন্নয়নকেন্দ্র বা হিমঘরে যাওয়ার রাস্তাই তৈরি হয়নি তো লোক যাবে কী করে? কেউ বলছে, সীমান্তে বড্ড বেশি কড়াকড়ি হওয়ায় বাংলাদেশে আনারস যাচ্ছে কম।

বাম-জমানায় সরকার যে দু'টি সংস্থাকে বরাত দিয়েছিল, তারা আনারস প্রসেসিং চালু করলেও কেন পাততাড়ি গুটিয়ে পালাল, তারও জবাব দেওয়ার মতো কেউ নেই। কবে মুখ্যমন্ত্রীর নজরে পড়বে, তবে এই সমস্যার সমাধান হলেও হতে পারে— এই যুক্তির কোনও মানে আছে? আমরা ডুয়ার্স তথা উত্তরবঙ্গবাসী হামেশাই বঞ্চনা-অবহেলার জিগির তুলি, অভিযোগের আঙুল ওপার বাংলায় বসে থাকা কর্তাদের দিকে, অথচ আজ অব্দি আমরা কোনও নেতা পেলাম না, যিনি অভিভাবকের মতো ডুয়ার্স-তরাইয়ের আওয়াজকে সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারবেন। দুর্ভাগ্য আমাদেরই।

শালিনী রায়, আলিপুরদুয়ার জংশন

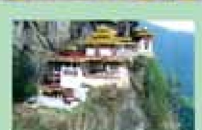

• Buxa Tiger Reserve • Chilapata Reserve • Coochbehar Palace • Gateway to Bhutan

The Heritage Duars Welcomes You

How do you reach

Nearest Railway Station : Dalgaon-Birpara and Hasimara on Kanchankanya Express Route. Falakata and New Coochbehar on general NJP-Assam route (Uttarbanga/Teesta-Torsha/Garib Rath/Kanchanjungha/Saraighat Express).

By Road : Accessible from Siliguri/Bagdogra/NJP and Coochbehar/Alipurduar

Best of Accommodations

Madarihat Tourist Lodge

A WBTDC owned resort with AC rooms and cottages, restaurant and bar, playing ground for the kids.

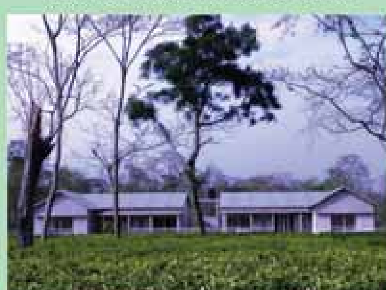

Acacia Resort

An eco resort in the midst of sprawling tea gardens and wilderness of Khayerbari with marvelous stay and dining.

Jaldapara Tourist Nest

A cosy nature resort in a homely atmosphere, facilities of food-stay and indoor games-library, on the way to Totopara.

Duars Eco Wonders. Kolkata booking 18/7 Dover Lane, Kolkata 700 029 Phone 9903832123, 9830410808, 033-65360463

ভূমিকম্পে জেরবার নগর ডুয়ার্স কি একদিন নিকেশ হয়ে যাবে?

ডুয়ার্স এলাকার অবস্থান হিমালয়ের পাদদেশে। এর উত্তর সীমা ঘেঁষে রয়েছে হিমালয়ের ফল্ট জোন। ভূতাত্ত্বিক গঠনের উপরে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টা অনেকটাই নির্ভর করে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ডুয়ার্সের ভূতাত্ত্বিক গঠন বেশ হালকা ধরনের। বালি, নুড়ি, পাথর... মূলত এসবই হল ডুয়ার্সভূমির মূল উপাদান। হালকা গঠনের ডুয়ার্স তাই ভূকম্পে ভালই সাড়া দেবে, এটা আর বলে দিতে হয় না। এ অঞ্চলে ভূমিকম্পের কারণে মাটি বসে যাওয়ার মতো ঘটনা অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে। এর ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট হতে পারে, যদি শক্তিশালী কোনও কম্পন হয়। ২০১১ সালের ভূমিকম্পের পর ডুয়ার্সের অনেক বাড়ির মেঝেতে গোলাকার ফাটল লক্ষ করা গিয়েছিল। এগুলি ছিল মাটি বসে যাওয়ার ইঙ্গিত।

মিরিকে যে ভূমিকম্প সাম্প্রতিক অতীতে ঘটেছিল, তার মাত্রা ছিল সম্ভবত ৫.৫ কি ৫.৬। এই মাত্রা আরেকটু বাড়লে ডুয়ার্সের কপালে দুঃখ আছে, তা অনুমান করা সহজ। বস্তুত, ডুয়ার্স হল ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। আমরা ডুয়ার্সবাসীরা আসলে থাকি চার নম্বর ভূমিকম্পপ্রবণ ‘জোন’-এ। অত্যধিক ক্ষয়ক্ষতিসম্পন্ন না হলেও চার নম্বর জোন-এর অর্থ, যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এমন অঞ্চল। মণিপুর অবশ্য জোন পাঁচ-এ পড়ে এবং সেটা অত্যধিক ক্ষয়ক্ষতিসম্পন্ন অঞ্চল।

কিন্তু এই জোন বা অঞ্চলগুলি ম্যাপিং করা হয়েছে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তাই চার নম্বর জোন-এ অত্যধিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটানোর মতো ভূমিকম্প হবে না... এমন সরলীকরণের কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই, ভূমিকম্পে ডুয়ার্স যে চুরমার হয়ে যাবে না, তা জোর দিয়ে বলি কীভাবে? কম্পন ডুয়ার্স থেকে কত দূর হচ্ছে, কী ধরনের ভূখণ্ডে হচ্ছে, কতটা তীব্র হচ্ছে— এসবের উপরে নির্ভর করবে ডুয়ার্সের ক্ষতির পরিমাণ। মোদ্দা কথা হল, ভূমিকম্পের সাপেক্ষে ডুয়ার্স খুবই অসুরক্ষিত। এমন হয়ত হবে না যে, এপিসেন্টার জলপাইগুড়ি কিংবা কোচবিহারে হল। কিন্তু ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও জোরালো ভূমিকম্পের এপিসেন্টার যদি ভবিষ্যতে দেখা যায়, তবে বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। সুকনার পাদদেশীয় অঞ্চল বা ভুটানের পাদদেশীয় অঞ্চলে জোরালো ভূমিকম্প যখন-তখন হতেই পারে। মনে রাখতে হবে যে, ২০১১ সালে ভূমিকম্পের এপিসেন্টার ছিল উত্তর সিকিমে। সেটা দক্ষিণ সিকিমে যে হবে না, তার নিশ্চয়তা কী? সে ক্ষেত্রে ডুয়ার্স এলাকা থেকে এপিসেন্টারের দূরত্ব আর কতটুকু থাকবে! সেই কম্পনে ডুয়ার্সের ক্ষয়ক্ষতি অনুমান করলেই শিউরে উঠছি।

ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় বাড়িঘর তৈরির ব্যাপারে ডুয়ার্সে কোনও নিয়ম আদৌ মানা হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না। বহুদিন অবধি ডুয়ার্সে বাড়ি তৈরি হত কাঠ আর ‘ডাব ওয়াল’ দিয়ে। বাঁশের বেড়ার উপর গোবর লেপে তৈরি হত এই ডাব ওয়াল। পরে গোবরের বদলে দেওয়া হত সিমেন্টের প্রলেপ। রাজবংশী, গারো, মেচ... সবাই এই ধরনের বাড়িই বানাত, যেগুলো ভূমিকম্প হলে বেশি ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়ে উঠত না। মাটির বাড়ির প্রচলন ছিল না এদিকে, কারণ এদিককার মাটি ভাল মানের কাদামাটি নয়। ডুয়ার্সের শহরগুলিতেও পাকা ছাদের বাড়ির বদলে টিনের চাল দেওয়া ডাব ওয়ালের বাড়ি প্রচুর ছিল এই সে দিন পর্যন্ত। আমার মতে, এখনও ডুয়ার্সে ভূমিকম্পের মোকাবিলা করার উপযোগী বাড়ি খুব বেশি হলে দোতলা এবং দোতলার ছাদ হওয়া উচিত টিনের। এতে বাড়ির স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

কিন্তু এসব মানছে কে? বলছি না ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকায় বহুতল নির্মাণ করা অসম্ভব। কিন্তু তার জন্য যে ব্যয়সাধ্য প্রযুক্তি দরকার, তা ডুয়ার্সের ক'টা বহুতলে রয়েছে? ডুয়ার্সের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় এমনিতেই দালানের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। তার উপর গত তিন-চার বছরে ক্রমাগত ভূমিকম্পে অনেক দালানই কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। ভবিষ্যতে মাঝারি মানের কোনও কম্পন যে এইসব বহুতলের কোনও কোনও অংশ ভেঙে পড়বে না, তা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। বিশেষজ্ঞরা এর মধ্যেই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বর্তমান সময়ে বারবার ভূমিকম্প ঘটবে। ফলে ডুয়ার্সের অনেক বাড়িঘর ক্রমশ দুর্বল হতে হতে বিপজ্জনক জায়গায় চলে যাবে— এ কথা সহজেই অনুমেয়।

ডুয়ার্সের মধ্য দিয়ে প্রায় সত্তর-বাহাত্তরটি নদী প্রবাহিত। অতীতে তীব্র ভূমিকম্পের কারণে নদীগুলির গতিপথ পরিবর্তন করার ইতিহাস আমাদের জানা। তবে অন্তত নয় মাত্রার কম্পন ঘটলেই এমন ঘটতে পারে বলে আমরা জানি। এমন ঘটলে সত্যিই ডুয়ার্সের কপালে শনি নাচছে।

তবে দার্জিলিঙের অবস্থা সত্যিই অতি ভয়ানক। মিরিকে যে কম্পন হয়েছিল তা দার্জিলিঙের কাছাকাছি হতেই পারে যে কোনও সময়ে। এপিসেন্টারের দরকার নেই। যদি দার্জিলিঙের কাছাকাছি পাঁচ মাত্রারও কম্পন হয়, তবে ওই শহর ধূলিসাৎ হতে খুব বেশি সময় নেবে না। দার্জিলিঙে অবৈজ্ঞানিকভাবে গড়ে ওঠা অজস্র কংক্রিটের কাঠামোই হবে এই বিপর্যয়ের কারণ। গ্যাংটক সে তুলনায় অনেক সুরক্ষিত। কংক্রিটের ঘনত্ব দার্জিলিঙে সহনীয় সীমার বাইরে চলে গিয়েছে অনেকদিন। দার্জিলিং নিয়ে আমার মাঝে মাঝেই তীব্র আশঙ্কা হয়।

ভূমিকম্পের কারণে হয়ত ডুয়ার্সের মাটি দু'ফাঁক হবে না। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে আলিপুর অবধি যেভাবে অবৈজ্ঞানিক বহুতল আর দালানে ছেয়ে আছে, তা যে কোনও সময় কোনও জোরালো কম্পনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে অজস্র ক্ষতি আর প্রাণহানির কারণ হতে পারে। জানি না, এই ভয়ংকর ভবিষ্যতের হাত থেকে ডুয়ার্স কীভাবে নিজেকে মুক্ত রাখবে। এক যদি স্বয়ং প্রকৃতি দয়া করে!

জাতীশ্বর ভারতী

ভাঙা আয়নায় টুকরো ডুয়ার্স

স্বর্গের দুয়ারে তালা !

বেতন নেই। চেনা গত হঠাৎ থমকে গিয়েছে। থমকে গিয়েছে অনেক কিছুই। যতই নিপুণ হয়ে উঠুক ডুয়ার্স পর্যটনের তুলিতে। চালসা গেলেই মনটা অন্যরকম। বিশেষত শীতে। অদ্ভুত কুয়াশা ছেয়ে নিয়েছে চারদিক। পাহাড়ে উঠে যাওয়া পথটা কী মায়ায় টানে। কতবার, কত কতবার এই পথে গেছি। তবু এক ফোঁটা পুরনো মনে হয় না। পথ যেন পথের নেশাতেই টানে। বুম্বা আমার সঙ্গে একমত হচ্ছিল। বেতন পায়নি অনেক মাস। তবু ঝকঝকে হাসিতে শুনতে চায় ভাল ভাল কথা। বলল, 'অমিতদা, সত্যিই এ জায়গা স্বর্গ। আমিই তো কতগুলো বছর কাটিয়ে দিলাম কিলকটে। তবু প্রত্যেকদিন নতুন মনে হয়।'

ওদের কাছেও কথাটা আকস্মিক ঠেকেছিল একদম নতুন। ডানকানের বাগান বন্ধ হতে পারে! কল্পনাতীত। আর যা-ই হোক— ডানকান? গোয়েঙ্কাদের উপর কী নিটোল নিবিড় ভরসা। আসলে চা-বাগানের জীবনটাই তো অন্যরকম। অন্য ছন্দে বাঁধা। তারা নিজেদের গণ্ডির বাইরের পৃথিবীটাকে খুব বেশি চিনত না। হয়ত চেনার ফুরসতও পেত না। কাজ আর কাজ। একদম ছন্দে বোনা জীবনযাত্রা। তার সঙ্গে বাগানের সাইরেনের আওয়াজ মেশানো। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলা।

কিলকট বন্ধ হতে পারে কে আঁচ করবে! একটা ধোপদুরস্ত বাগান। পরতে পরতে সৌন্দর্য। চা-পাতায় খামতি নেই। অথচ সেখানে তালা ঝোলে কীভাবে!

অনেকগুলো বন্ধ বাগান ঘুরে বেড়ালাম। আসছে দিনগুলোয় আবারও যাব। বাতাসেও কেমন যেন একটা শূন্যতা। কেমন বোবা দৃষ্টি চারদিকে। যে সহজ হাসিগুলো আগে পেতাম—তা উধাও।

বড়বাবু কিছুতেই অঙ্ক মেলাতে পারছেন না। এতজনকে যিনি এত নিষ্ঠায় দক্ষতায় সামলে এসেছেন এতকাল, তিনি নিজের গণিত মেলাতে পারছেন না। ছেলেটা এত মেধাবী হল কেন! তিনি গোটা দিন কাজ করতেন, বাইরের পৃথিবীতে কী হচ্ছে নাক গলাতেন না। ছেলেটা ছোট্টবেলা থেকে জানান দিল, তার জন্য অনেক বড় পৃথিবী অপেক্ষা করছে। ওকে বড় করতেই হবে। জলপাইগুড়িতে নামী ইংরেজি মাধ্যমে ভরতি করে দিলেন। নিজের চা-বাগানের কোয়ার্টাররের ছবিটা পালটে গেল অনেকটাই। তবু ছেলের জন্য করতে হবেই তো! ছেলেও বাবাকে কাঙ্ক্ষিত আনন্দ দিতেই লাগল। মাধ্যমিকে সে ৯৭ শতাংশ পেয়ে খুশির বন্যা এনে দিল। বাগানের ফ্যাক্টরি থেকে বাবা বললেন, কিচ্ছু ভাবনা করবি না, আমি আছি তো। তোকে অনেক দূর যেতে হবে।

ছেলে চলল রাজস্থানের কোটায়। সর্বভারতীয় পরীক্ষার প্রস্তুতি। সবাই বড়বাবুর কাছে জানতে চায় ছেলের কথা। গর্বে তাঁর বুক ভরে ওঠে। আর বেশি দেরি নয়। দু'হাজার ষোলোর জয়েন্টে সে তার স্বপ্নের জায়গায় ভরতি হবে। যেটুকু সঞ্চয়, ওর জন্যই ঢেলে দেবেন বড়বাবু। শেষ বয়সে চিন্তা নেই, বাগান ছেড়ে ছেলের কাছে। অনেক কাজ করেছেন। তখন আনন্দের ছুটি। স্বপ্নগুলো বেশ ঠিকঠাক এগচ্ছিল। চা-বাগিচার মতোই সাজানো-গোছানো, ছবির মতো।

বাগানের বেতন বেশি না হলেও কত সুযোগ-সুবিধে। রাজকীয় কোয়ার্টার, বিদ্যুৎ-জলের চিন্তা নেই, কাজের লোকের দুর্ভাবনা নেই, র‍্যাশনিং-এর সুবিধা।

হঠাৎ যেন আকস্মিক ঝড়। ঝড়, অথচ আওয়াজ নেই। হাওয়া নেই, তবুও ভয়ংকর ঝাপটা আছে। বাগান বন্ধ। কেন বন্ধ— কেউ জানে না। এত সুন্দর উৎপাদন, কাজে খামতি নেই— তবু বাগান আর চালানো যাচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই বেতন বন্ধ।

শ্রমিকরা চলল অন্য বাগানে পাতা তুলতে। পাতা তোলার সিজনে তাদের কাজের অভাব নেই। বরঞ্চ দি-হাজিরা পেতে ভালই লাগে! কারণ পি.এফ. না-কাটা থাকায় পুরো হাজিরাটাই হাতে হাতে। কেউ কেউ অন্য কাজে। কিন্তু বড়বাবু তো অন্য বাগানে পাতা তুলতে যেতে পারবেন না! কোথায় কার কাছে কাজ চাইবেন তিনি! এতকাল সম্ভ্রমের সঙ্গে, সম্মানের সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। এক টুকরো ফাঁকি দেবার কথা ভাবেননি। উপরমহলের নির্দেশ তাঁর কাছে ছিল বেদবাক্যের মতো। তাঁর অধস্তন ও শ্রমিকদের কাছে তিনি যেন অভিভাবক ছিলেন।

ঘরে আলো জ্বলছে না। অন্ধকারে বসে আছেন বড়বাবু। ছেলে জয়েন্ট এন্ট্রান্সগুলোর জন্য এখন দিনরাত খাটছে। কোন আই.আই.টি.-তে ভরতি হবে, তার প্রেফারেন্স তৈরি করছে। তারপর বিদেশ। আর অন্ধকারে বসে বড়বাবু ভাবছেন, যে টাকা জমিয়েছেন তা দিয়ে কত দূর টানবেন। রোজকার খাওয়া খরচ, পোশাক-আশাক, সামাজিকতা— সব মিটিয়ে ছেলের জন্য মাসে মাসে পাঠানো। তাঁর অ্যাকাউন্টের টাকা তাঁর কাছেই মনে হয়— এত সামান্য! ছেলের মুখটা অন্ধকারে চোখের সামনে ভাসতে থাকে। হু-হু করে বুকটা। কী করবেন! কাকে বলবেন! কোনও খড়কুটোও দেখতে পান না বড়বাবু।

শ্রমিকমহল্লার কথা বলছিলাম। কষ্ট আছে, কিন্তু অনেকটাই নিরুত্তাপ। তারা জানে, আজ বন্ধ, কাল হয়ত খুলবে। দারিদ্রের সঙ্গে ফাইট করার ক্ষমতা ঈশ্বর তাদের দিয়েছেন। এক বুড়ো হাড়িয়ামুখর হাড়জিরজিরে চা-শ্রমিক আকাশের দিকে শূন্য হাত তুলে অনেক কিছু বুঝিয়ে দিলেন।

এক কর্মহীন ক্লার্ক আমাকে বলতে লাগলেন, চা-শ্রমিকের মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক। খবরের কাগজে তা নিয়ে তোলপাড় হয়, রাজনীতি হয়। কিন্তু বেতনের অভাবে তারা মরছে তা ঠিক নয়, তারা অন্য কাজ খুঁজে নিচ্ছে, পাচ্ছেও। বিভিন্ন কাজে শ্রমিকের চাহিদা প্রচুর। তারা এখন দল বেঁধে গাড়ি ভাড়া করে খেতে আলুর কাজে যাচ্ছে। বাড়ি নির্মাণের কাজে ছুটছে। কেউ কেউ হাড়িয়া খেতে খেতে শরীর শেষ করে হয়ত চলে গেল। তা নিয়ে বন্ধ বাগানের গল্প লেখা হবে। কিন্তু আমরা এখন রোজ বেঁচে বেঁচে মরি। যেভাবে জীবনটা সাজিয়েছিলাম, সব তছনছ। লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারি না। এবার পুজোয় জামাকাপড় কিনিনি। ছেলেমেয়ের বইপত্র কেনা থমকে আছে। হস্টেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে হচ্ছে। জানেন, একটু অহংকার শোনালেও এটা সত্যি, আমরা চা-বাগানের বাবু সম্প্রদায় ইংরেজের শেখানো অনেক ম্যানারস বংশপরম্পরায় বয়ে চলেছি। একটি নিপুণ ঐতিহ্য আমাদের, আমরা হাত পাততে শিখিনি। আমাদের ঘরে ঢুকলেই বুঝবেন, এখানে কী রয়েছে। অন্যের চেয়ে আমরা কোথাও অনেকটাই আলাদা। সেই ঘরে বিদ্যুতের লাইন কেটে দিয়েছে। কী অপমান! মৃত্যুর চেয়েও বড় বেশি কষ্টে আমরা বেঁচে আছি।

পথিক বর

নিঃশব্দ বিপ্লব ডুয়ার্সে

টো টো কোম্পানি

এই বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা যখন সত্যিই ‘চিন্তিত’, ‘বিপ্লব’ যখন গিয়েছে বনবাসে কিংবা কোনও ‘অবৈধ’ হানিমুনে, ঠিক তখনই মধ্যবিত্তের পথচলায় নতুন ‘উপদ্রব’ হয়েও কিঞ্চিৎ সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে এক নিঃশব্দ বিপ্লব নিয়ে এল এই শব্দহীন যান। ভ্যাগাবন্ডের মতো টো টো করে ঘুরে বেড়ানো ছেড়ে এ বঙ্গের আনাচকানাচে টো টো গাড়ি কিনে দু’পয়সা রোজগারের উদাহরণ এখন বিস্তর। ডুয়ার্সও এর বাইরে নয়। তিস্তা-তোর্সা-জলঢাকা বিধৌত ভূখণ্ডে ‘টোটো’ বলতে এতদিন অবশ্য বোঝাত পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম উপজাতিটিকে। উক্ত উপজাতির কেউ কেউ তাঁদের জাতিগত পরিচয়ে একটি যাত্রীবাহী ত্রিচক্রযানকে পরিচিত হতে দেখে দুঃখ প্রকাশ করলেও, শব্দ এবং তার অর্থের আকস্মিক সম্পর্ককে মেনে নিয়েছে। ডুয়ার্সে ‘টোটো’ এখন নতুন অর্থেই জনপ্রিয়। এ গাড়ি বিদ্যুতে চলে। ব্যাটারির পজিটিভ আর নেগেটিভের মতো ডুয়ার্সের টোটো সংস্কৃতি নিয়ে অতঃপর দু’কথা শোনাই আপনাদের।

টোটো পজিটিভ

ডুয়ার্স অঞ্চলে টোটোর আবির্ভাবের ফলে আর যা-ই হোক, জনগণের দশ টাকায় বেশ খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করতে খুব একটা বেগ পেতে হচ্ছে না, সাইকেল রিকশার জন্য হাহুতাশ দশা কেটেছে। ফলস্বরূপ যাত্রীর মুখে হাসি। যিনি নিজের একটা টোটো কিনতে পেরেছেন, যার দাম প্রায় এক লক্ষ টাকার আশপাশে, তাঁর জন্য এটা অবশ্যই লাভজনক। সেটা সম্ভব না হলে কিস্তিতে ভাড়া নেওয়ার একটা ব্যবস্থা আছে, মোটামুটি ৩০০ টাকা দিনপ্রতি হিসেবে। এর ফলে ডুয়ার্সের সর্বত্র টোটো। একটা টোটোর জন্য আপনাকে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না এমনি এর সমাগম শহরের সর্বত্র। টোটোর অভাবে মুখ কালো করে বাড়ি ফেরার দরকারই হবে না।

টোটোচালকদের মতে, ডুয়ার্সে সর্বপ্রথম বীরপাড়াতে টোটো দেখতে পাওয়া যায়। সময়টা ঠিক আন্দাজ করা না গেলেও গত দু'-তিন বছরের বেশি হবে না, কারণ ভারতের বড় শহরগুলোতে ২০১১ সাল নাগাদ এই নিঃশব্দ যানের আনাগোনা শুরু হয় নিঃশব্দেই। এর পর দেখতে দেখতে ডুয়ার্সের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দ যানটি। শব্দ দূষণ তো নেই, উপরন্তু একটু ভিড় রাস্তায় হঠাৎ পিছন থেকে হর্ন শুনতে পেলে যানের সাড়া মিলবে, তা না হলে ঠাহর করা একটু মুশকিল। জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়িতেই চার হাজারের বেশি টোটো রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোচবিহারে বর্তমান সর্বাধিক টোটোর আনাগোনা, যার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজারের বেশি। সুতরাং বলাই বাহুল্য, আপনার এ চত্বরে হাঁটার কথা ভাবার আগেই আপনার সামনে টোটো এসে হাজির হবে।

টোটোকে ইলেকট্রনিক রিকশাও বলা হয়ে থাকে, তবে বিভিন্ন স্থানে এর বিভিন্ন স্থানীয় নাম রয়েছে। ডুয়ার্স অঞ্চলে একে টোটো বলা হয়ে থাকে। কে বা কারা এই নাম ঠিক করেছে— এটা বলে ফেলা একটু কঠিনই হবে। ঠিক উত্তর খুঁজতে গবেষণার প্রয়োজন হতে পারে, তাই সে প্রসঙ্গ আপাতত থাক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে টোটোর সমাগম যথেষ্ট। কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়ে থাকে নিঃশব্দ এই যানটিকে। যেমন— বাংলাদেশে অটো বলা হয়, ইজিপ্টে টুক টুক, পূর্ব আফ্রিকায় বোদা-বোদাস, ইন্দোনেশিয়াতে বেন্টর ডাকা হয়। ভারতে মূলত নয়ের দশকে 'Nimbkar Agricultural Research Institute' নামে একটি সংস্থা সবার প্রথম এই যানটিকে যাঁরা তৈরি করেন, তাঁদের মধ্যে একটি। বর্তমানে এ দেশের এবং চিনের টোটো বা ইলেকট্রনিক রিকশা উৎপাদন পৃথিবীতে সবচাইতে বেশি।

শহরের এক প্রান্ত থেকে একেবারে অন্য প্রান্তে বা শহরের বহির্ভূত অঞ্চলেও দিব্য পাড়ি দেওয়া যায় এই যান দিয়ে। এর ভাড়া নিয়ে খুব বেশি দামদর করার প্রয়োজন হয় না। নতুন বলে হয়তো যাত্রীই বাড়তি সুবিধা পান।

এমনকি শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষাকাল যা-ই হোক না কেন, রাতবেরাতে পরিবারের লোকজন নিয়ে বিয়েবাড়ির নেমন্তন্ন রক্ষা করার পর রাত ১২টা বেজে গেলে ভবনের সামনেই নিঃশব্দ যানের খুব বড় না হলেও ছোট্ট একটা জমায়েত দেখতে পাওয়া যাবে, একটু দামদর করলেই নিশ্চিন্তে বাড়ির দোরগোড়ায় ফিরে আসা যায়।

বলাই বাহুল্য, ইলেকট্রনিক রিকশাও বড় বা ছোট শহরের স্বল্প আয়ের লোকজনের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এসেছে, তা তিনি যাত্রীই হোন বা চালক। একটু চেষ্টাচরিত্র করে একটা টোটো কিনে ফেললে বা কিস্তিতে ভাড়া নিয়ে সহজেই গড়ে প্রতিদিন শ'পাঁচেক টাকার আমদানি হয়ে যায়। ডুয়ার্স অঞ্চলের শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকার, কাজের অভাবে শ্রমিক ফি-বছর পাড়ি দেয় ভিন রাজ্যে। তাদের হাত ধরেই আমদানি হয় চোরাচালান বা জাল নোট বা এইডসের মতো মারাত্মক সব ব্যাধি। আর যাদের বাইরে যাওয়ার মুরদ হয় না, তাদের ঝান্ডা হাতে অসামাজিক কর্মকাণ্ডে যোগ দেওয়া ছাড়া পেট চালানোর বিকল্প থাকে না। টোটোর আবির্ভাবে তারা যে আপাতত নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিভিন্ন পেশার মানুষ এসে যোগ দিয়েছে স্থানীয় পরিবহনের এই নতুন কাজে। দোকানে কাজ করা লোক, বাসের ড্রাইভার, খালাসি থেকে কন্ডাক্টর, দরজি, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, জলের পাইপের মিস্ত্রি— কে নেই এই দলে? সকলের এক মত, 'ভাল আছি দাদা, দুটো পয়সা রোজগার হচ্ছে, পরিবারের লোকের সঙ্গে সময় কাটাতে পারছি আর কী!' সে দিন কথা হল জলপাইগুড়ি শহরের তপন সরকারের সঙ্গে। তাঁর একখানা রকমারি জিনিসের ব্যবসা ছিল শহরের এক প্রান্তে। কিন্তু সেখান থেকে আয়ের টাকায় সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ছিল বলেই আজকে টোটো চালাচ্ছেন, এতে তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। বরং বলছেন, ভালই লাগছে, কারণ পরিবারের লোককে ভাল রাখতে পেরেছেন বলে। ওঁর মতো অসংখ্য মানুষ যুক্ত হয়েছেন স্বাধীনভাবে করতে পারা এই কাজে। এক শহরের মানুষ আবার আরেক শহরেও পাড়ি দিচ্ছেন এই টোটোচালকের জীবিকার উদ্দেশ্যে।

নিঃশব্দ যানটি মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারলেও এক বিশেষ শ্রেণির মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন। ঠিকই ভাবছেন, সাইকেল

ডুয়ার্স অঞ্চলের শিক্ষিত- অশিক্ষিত বেকার, কাজের অভাবে শ্রমিক ফি-বছর পাড়ি দেয় ভিন রাজ্যে। তাদের হাত ধরেই আমদানি হয় চোরাচালান বা জাল নোট বা এইডসের মতো মারাত্মক সব ব্যাধি। আর যাদের বাইরে যাওয়ার মুরদ হয় না, তাদের ঝান্ডা হাতে অসামাজিক কর্মকাণ্ডে যোগ দেওয়া ছাড়া পেট চালানোর বিকল্প থাকে না। টোটোর আবির্ভাবে তারা যে আপাতত নতুন দিশা খুঁজে পেয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

রিকশাচালকের কথাই বলছি। কোথাও কোথাও এখনও রিকশার আধিপত্য থাকলেও সেই দাপট নেই। মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, সন্ধে হলেই বা বর্ষাকালে খামখেয়ালিপনা আজ উধাও। তবে তার পিছনে যে উল্লেখ্য কারণ রয়েছে তা হল, ৩১ জুলাই ২০১৪-য় দিল্লি হাই কোর্ট টোটোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। ঠিক তেমনই শিলিগুড়ির মূল রাস্তাগুলোতে টোটোর প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে পেট্রোলচালিত সিটি অটো ইউনিয়নের আন্দোলনের জেরে, তবে সাইকেল রিকশার ক্ষেত্রে অনুমতি আজও আগের মতোই বর্তমান। তবে রিকশাচালকরা বা কাটা তেলে চলা অটোচালকরা এ সত্য উপলব্ধি করেছেন যে, কালের নিয়মেই এবার তাঁদের পাততাড়ি গোটাবার পালা আসন্ন।

অনেকের মতেই যানটি ব্যয়বহুল, কারণ যে অর্থনৈতিক সমাজের মানুষ যানটি কেনার পরিকল্পনা করেন, তাঁদের পক্ষে একবারে এক লক্ষ টাকার বেশি বিনিয়োগ করা কষ্টকর, এবং এর জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ প্রদানের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় যা কিছু করার সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে করতে হয়। আবার এর পালটা যুক্তি হল, লাখখানেক টাকার আজকের দিনে যা দাম, তাতে টোটো ছাড়া আর কিছু করা বোধহয় সম্ভব নয়। এ টাকায় নেতারা আজ আর চাকরি দেন না। বরং লাখখানেক টাকা জোগাড় করে ফেলতে পারলেই মেলে যুক্তি, মুক্তি ঋণের বোঝা থেকে, মুক্তি দাসত্ব থেকে। যে মুক্তি আজও তরুণের স্বপ্নই থেকে গিয়েছে। যেমন কোচবিহার শহরের রাজা ঘোষ সাহস করে তাঁর অনেক দিনের ডিস্ট্রিবিউটরের অধীনে বিক্রেতার চাকরি ছেড়ে কিছু নিজের জমানো টাকা আর কিছু টাকা বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে জোগাড় করে একটা টোটো কিনেই বাড়ি ফিরল গত বছর। এখন যে যখন খুশি কাজে বেরয়, ফেরে। সে জানে, টোটো চালিয়ে ইমারত গড়া হয়ত যাবে না, কিন্তু একদিন রোজগার ভাল হলে পরদিনটা বউ-বাচ্চাকে নিয়ে উপভোগ করতে পারে, কোথাও কোনও চাপ নেই।

টোটো নেগেটিভ

টোটো কিছু লোকের সুদিন এনে দিয়েছে, সে টোটোচালক হতে পারে, টোটোর ফিটার হতে পারে। তা ছাড়া নিয়মে-অনিয়মে হাজারো কারখানা রয়েছে, আবার হাজারো কারখানার উপর নিষেধাজ্ঞাও আনা হয়েছে, যদিও এই নিষেধাজ্ঞার পিছনের কারণ মূলত যাত্রীসুরক্ষা। নতুন নতুন নিয়ম তৈরি হচ্ছে, কখনও বা নম্বর দেওয়া হচ্ছে, কখনও আবার নিষেধাজ্ঞা, কখনও বিশেষ কতকগুলো রাস্তা টোটোর জন্য বন্ধ। অতএব সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আমরা সবাই এই নতুন যানটি পেয়ে একে নিয়ে ঠিক কী করা উচিত, সেটা ঠিক করতে করতেই অনেকগুলো দিন কেটে গেল। এর মধ্যে টোটো মালিকদের ইউনিয়ন হয়েছে, টোটো চালকদেরও ইউনিয়ন হয়েছে, ডুয়ার্সের বিভিন্ন শহরের চালক এবং মালিকরা নিজেদের মতো করে ইউনিয়ন তৈরি করে নিয়েছেন। কিন্তু এখনও অব্দি তৈরি হয়নি কোনও সরকারি নিয়ন্ত্রণবিধি বা নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড। ফলে যাত্রীর খোঁজে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে টোটো, রাস্তাঘাটে তৈরি হচ্ছে প্রচণ্ড যানজট। তেমনই যাত্রীনিরাপত্তা উপেক্ষা করে হাইওয়েতে বা দ্রুত যান চলাচলের রাস্তাতেও চলাফেরা করছে টোটো, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

কোথাও কোথাও রিকশাচালকদের ‘দোষ’গুলিতে এখন টোটোচালকরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। ভাড়ার ব্যাপার নিয়ে অবশ্য সমস্যা নেই। সমস্যা ‘কোথায় যাবেন’ নিয়ে। ‘ওদিকে যাব না’ কথাটা রিকশাচালকদের মতো টোটোচালকরাও কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন। ডুয়ার্সের ছোট জনপদগুলিতে এই সমস্যাটা না থাকলেও বড় জনপদের যাত্রীরা মুখোমুখি হতে শুরু করেছেন উক্ত ‘ওদিকে যাব না’ নামক শীতল প্রত্যাখ্যানের। তবে টোটোদের রুট নির্দিষ্ট করে দিলে এ সমস্যা গোড়াতেই মিটে যাবে বলে যাত্রীদের ধারণা।

একটি টোটোতে চালক বাদে সওয়ার হতে পারেন সর্বাধিক চারজন। সুযোগ পেলেই সংখ্যাটা চারের জায়গায় আট করতে দু’বার ভাবেন খুব কম টোটোচালকই। এটা খুব

মোটর ভেইক্‌লস আইনকেও টোটো নিশ্চিন্তে কলা দেখাতে পারে। কারণ, এ গাড়ির ইঞ্জিন নেই। তেলে চলে না। ফলে, ডুয়ার্সের ভ্রাম্যমাণ হাজার হাজার টোটো কোনও সরকারি অনুমোদন ছাড়াই দিব্যি যাত্রী বহন করে চলেছে। সামনেই বিধানসভার ভোট। অতএব সহজেই অনুমান করা যায় যে, আশু কোনও নিয়ম চালু হচ্ছে না টোটো কোম্পানির জন্য। ফলে আপাতত নিশ্চিন্তে টোটোচালকরা। আপাতত রাজনীতি বা প্রশাসনের 'তোলাবাজ'দের হাত থেকে নিষ্কৃতি।

বিপজ্জনক প্রবণতা। গয়েরকাটার অভিজ্ঞ টোটো মেরামতকর্মীর মতে, 'বেশির ভাগ টোটোর ব্যালেন্স ভাল নয়। শক অ্যাবজর্ভার বলে কিছু নেই। গাড়িও তেমন মজবুত নয়। তিনশো কেজির বেশি লোড দেওয়া মানে যখন-তখন ভেঙে পড়ার চান্স!' ধূপগুড়ির বিজয় সাহা, যিনি তিনটে টোটো রোজ চুক্তিতে খাটান, জানালেন, 'কেনার সময় বুঝিনি। এখন বুঝেছি, এ গাড়িগুলো খুব একটা মজবুত নয়। তা ছাড়া গাড়ির ডিজাইনেও অনেক ফল্ট আছে।'

যানটি শব্দ দূষণ থেকে বেশ খানিকটা মুক্তি দিলেও বায়ু দূষণের ক্ষেত্রে খুব জোর দিয়ে কিছু বলা ঠিক হবে না। ব্যাটারি ব্যবহার হতে থাকলে তার থেকে লেড (Pb) নির্গত হতে থাকে, যা জল, বায়ু এবং মাটিকে দূষিত করে। যদিও অন্য যেসব যান, যেগুলো আমরা ব্যবহার করে থাকি, যেমন— অটো, মোটর সাইকেল বা লোকাল বাস, এখনও যার ইন্ধন, মানে তেল বা সামান্য কিছু ক্ষেত্রে গ্যাস, কিন্তু গ্যাসচালিত গাড়ির এ অঞ্চলে এখনও তেমন ব্যবহার নেই বললেই চলে এবং এদের তুলনায় টোটোর দূষণমাত্রা কিছুই নয়।

বস্তুত, ভাল মানের একটি ব্যাটারি রিকশার দাম বাজারে প্রায় পৌনে দু'লাখ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু ডুয়ার্সে যেগুলো চলমান, তার সিংহভাগই কোনও অনুমোদিত কোম্পানির প্রোডাক্ট নয়। ডুয়ার্সে গজিয়ে ওঠা অসংখ্য টোটো অ্যাসেম্বলের দোকানে যে হাজার হাজার গাড়ি জোড়া দেওয়া হয়েছে, সেসব কোথা থেকে এসেছে, তা খুব অস্পষ্ট। জোর সন্দেহ যে এগুলির অধিকাংশই 'মেড ইন চায়না'। 'তা না হলে বাজারে পঁচাত্তর, সত্তর... এমনকি ষাট হাজার টাকায় টোটো বিক্রি হয় কীভাবে?' উষ্মার সঙ্গে বললেন রায়গঞ্জের নিত্য রায়। তিনি এখনও টোটোর বদলে রিকশায় চাপতেই আগ্রহী। কারণ, রিকশাচালকরা এখন অনেক সহযোগী মনোভাবসম্পন্ন। অন্য দিকে, মাসকয়েক আগে রাজ্য সরকার অনুমতিহীন টোটো নির্মাতাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ায় রাশি রাশি দোকান রাতারাতি ঝাঁপ ফেলেছে।

টোটো কনফিউজিং

শহরের পথে টোটোর ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি লক্ষ করে যাঁরা এ গাড়িগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য মুখর, তাঁদের জন্য প্রাথমিক দুঃসংবাদ হল— পুরসভাগুলি টোটোকে ঠিক কী মাপকাঠিতে লাইসেন্স দেবে, তার কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম এখনও তৈরি হয়নি। রিকশাকে যেভাবে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া যায়, সেভাবে পুরসভা বা পঞ্চায়েত টোটোকে দিতে পারছে না। কারণ, টোটো মানুষ টানে না, সে চলে মোটরের জোরে। এইরকম কোনও কিছুকে নথিভুক্ত করতে পারে না উক্ত সংস্থাগুলো। আবার সাধারণ মোটর ভেইক্‌লস আইনকেও টোটো নিশ্চিন্তে কলা দেখাতে পারে। কারণ, এ গাড়ির ইঞ্জিন নেই। তেলে চলে না। ফলে, ডুয়ার্সের ভ্রাম্যমাণ হাজার হাজার টোটো কোনও সরকারি অনুমোদন ছাড়াই দিব্যি যাত্রী বহন করে চলেছে। সামনেই বিধানসভার ভোট। অতএব সহজে অনুমান করা যায় যে, আশু কোনও নিয়ম চালু হচ্ছে না টোটো কোম্পানির জন্য। ফলে আপাতত নিশ্চিন্তে টোটোচালকরা। আপাতত রাজনীতি বা প্রশাসনের 'তোলাবাজ'দের হাত থেকে নিষ্কৃতি। পরের কথা না হয় পরেই ভাবা যাবে।

টোটো পরিণাম

তবুও ডুয়ার্সে টোটোর এখনই কোনও বিকল্প নেই। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ডুয়ার্সের অর্থনীতিতে টোটোর আগমন একটু অতি ইতিবাচক ঘটনা। হতাশায় ডুবে থাকা বহু মানুষকে মর্যাদাসহ দু'পয়সা আয়ের সুযোগ যেমন এ গাড়ি দিয়েছে, তেমনই স্থানীয় যাত্রীদের দিয়েছে দশ টাকায় অনেকটা পথ পাড়ি দেওয়ার স্বস্তি। প্রখর গ্রীষ্মে, দিনভর বৃষ্টিতে কি হু হু শীতে দু'-পাঁচ কিলোমিটার দশ টাকায় যাওয়া রিকশার যুগে ছিল অবাস্তব। 'এটা ঠিক যে, দু'কিলোমিটার রিকশা টানিয়ে একটা লোককে দশ-পনেরো টাকা দেওয়াটাও অমানবিকতা। কিন্তু আমাদেরও তো সামর্থ্য কম। টোটো আসায় তাই অনেক সুবিধে হয়েছে।' জানালেন দশ দরগার কলেজ ছাত্রী নিকিতা।

তাই টোটো চলুক। ডুয়ার্সের পরিবেশকে হাসিখুশি রেখে এ পাড়ার মানুষকে নিয়ে যাক সে পাড়ায়। কেবল গাড়িগুলিকে করে তোলা হোক আরও বিজ্ঞানসম্মত, মজবুত ও সুরক্ষিত। সরকার এগিয়ে এসে রাস্তা দেখাক। টোটো কেনার জন্য ঋণ মঞ্জুরের ব্যবস্থা হোক। একটু বড় শহরে রুট অনুযায়ী চলুক গাড়িগুলি।

অমিত দাস

টোটোচালকদের জন্য পরামর্শ

❑ অনুমোদিত কোম্পানির টোটো বা বিদ্যুৎ চালিত রিকশা কিনুন। দাম একটু বেশি হলেও অনেক দিক থেকে সাশ্রয়। যাত্রীদের পক্ষেও আরামদায়ক।

❑ অন্যথায় গাড়ির টায়ার চওড়া রাখুন। সামান্য গতিতে থাকা গাড়ি একটু বেশি বাঁক নেওয়াতে গেলে উলটে যাচ্ছে বা ভারসাম্য হারাচ্ছে— এমন উদাহরণের অভাব নেই। টায়ার চওড়া হলে এই সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে।

❑ ভাল কোম্পানির ব্যাটারি ব্যবহার করুন। ব্যাটারির চার্জ সত্তর শতাংশ ফুরালেই চার্জে বসান। এতে ব্যাটারির আয়ু বাড়বে। চার্জার থেকে উপযুক্ত পরিমাণ ও শক্তির বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে কি না তা মিটারে মেপে নিন। ব্যাটারি ফাঁকা করার পর চার্জে বসানোর পরামর্শ অনেক টোটোচালককে দিয়েছেন বিক্রেতারা। এতে কিন্তু ব্যাটারি তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে যায়। সাবধান! ভাল ব্যাটারি কিন্তু চার্জের কারণে গরম হয়ে যায় না। তেমন হলে ব্যাটারি বদলে নিয়ে আসবেন।

❑ চারজনের বেশি যাত্রী নিচ্ছেন মানে ব্যাটারির আয়ু তাড়াতাড়ি ফুরাচ্ছে। ফলে অতিরিক্ত যা কামাবেন, তার দ্বিগুণ ব্যাটারি কিনতে বেরিয়ে যাবে ভবিষ্যতে।

❑ ড্রাই সেল ব্যাটারি নিলে এক বছর পর ডিস্টিল ওয়াটার ঢেলে উজ্জীবিত করে নিন। ভাল ফল দেবে।

❑ হেডলাইট ও অন্যান্য আলোতে এলইডি ব্যবহার করুন। গাড়ির ইলেকট্রিক ওয়্যারিং মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখবেন কোথাও শর্ট সার্কিট হচ্ছে কি না। তেমন হলে ব্যাটারির ক্ষতি হয়।

❑ টায়ারের হাওয়া ঠিক রাখা জরুরি। হাওয়া কমে গেলে ব্যাটারি বেশি পোড়ে। উপযুক্ত স্থানে পিচ্ছিলকারক তেল দিয়ে যত্ন নেওয়াও জরুরি। গাড়ির চলতে অসুবিধে মানেই ব্যাটারির উপর অতিরিক্ত চাপ।

বিশ্ববাজারে চায়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে শিল্পসংকটের হাঁক দিচ্ছে মালিক-ব্রোকার আঁতাঁত

আন্তর্জাতিক চা-বাজারে ভারত

দেড়শো বছর ধরে ভারতীয় চা ব্যবহারে, উৎপাদনে, এমনকি রপ্তানি ক্ষেত্রেও নেতৃত্বের প্রধান আসনটি ধরে রেখেছিল। আজ হঠাৎ এমন কী ঘটল যে, সেখানে আশঙ্কাজনক অনিশ্চয়তার ছায়া গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ফুটে উঠতে চাইছে।

ভারতে চায়ের ক্ষেত্রে বিশাল সুবিধা হচ্ছে এর নিজস্ব অভ্যন্তরীণ চাহিদা। Government Group of FAO তাদের আলোচনাতেই জানাচ্ছে, ২০১৯ সালের মধ্যে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা ১ লক্ষ টনের সীমা ছাড়িয়ে যাবে। ওই আলোচনার সূত্রেই বলা যায়, এ দেশে প্রতি বছর গড়ে ২ শতাংশ হারে চা-পানের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই হিসেব অনুযায়ী ২০১৯ সালে ভারতে চা উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়াবে ১.২ লক্ষ টন। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির জন্য থাকবে মাত্র ২০০ মিলিয়ন কেজি চা। অথচ চা-পানের চাহিদা শুধু ভারতের লোকের মধ্যেই নয়, সারা পৃথিবী জুড়েই দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

চা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ঘটছে নানা পরিবর্তন। ইতিমধ্যে বাজারে ইনস্ট্যান্ট চায়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজারে কনসেন্ট্রেটেড টি, ফ্রোজেন টি ইত্যাদির মতো নানা ধরনের চায়ের ব্যবহার চালু হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ চা এখন আর শুধু চা-গাছ থেকে পাতা চয়ন করে ফ্যাক্টরিতে উৎপাদনের সামগ্রী নয়। চা-কে নিয়ে সারা পৃথিবীর চা উৎপাদনকারী দেশগুলিতে চলছে ব্যাপক গবেষণা, চা হতে চলেছে আধুনিক শিল্পসামগ্রীর বহুমুখী উপাদান।

চায়ের এই সম্ভাবনা দেখে এখন পৃথিবীর অনেক দেশই চা উৎপাদনে এগিয়ে এসেছে। বর্তমানে পৃথিবীর চা উৎপাদক দেশের মানচিত্রে ৩৪টি দেশের নাম উঠে এলেও এখনও ৬টি দেশ— চিন, ভারত, শ্রীলঙ্কা, কেনিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৮৫ শতাংশ উৎপাদন করে চা-সাম্রাজ্যে রাজত্ব চালাচ্ছে। রপ্তানির ক্ষেত্রে কেনিয়া উঠে এসেছে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। সে চিন, শ্রীলঙ্কা ও ভারতকে সরিয়ে দিয়ে চা রপ্তানিতে এখন পৃথিবীর প্রথম স্থান দখল করে নিয়েছে।

চা শুধু ভারতীয়দের কাছে সবচেয়ে সস্তা উদ্দীপক পানীয় হিসেবে এই জনপ্রিয়তা পেয়েছে তা নয়। সারা পৃথিবী জুড়েই অন্য সব পানীয়কে পিছনে ফেলে এগিয়ে আসতে চলেছে। বাজার সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে,

একমাত্র রাশিয়াতেই ২০১৯ নাগাদ এর চাহিদা দাঁড়াবে ১ লক্ষ ৪১ হাজার টন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ওই সময়ে চায়ের চাহিদা হবে যথাক্রমে ১ লক্ষ ২০ হাজার, ১ লক্ষ ২ হাজার এবং ৭৩ হাজার টন।

মানুষ এখন ক্রমশই স্বাস্থ্যসচেতন হচ্ছে। ফলে আমেজের জন্যই পানীয়— এই ভাবনার পরিবর্তন ঘটছে দ্রুত। মদ্যপানের অপকারিতা নিয়েও মানুষের চেতনা ধীরে ধীরে হলেও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেখানে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্তিনাশক ও একই সঙ্গে সামাজিক আড্ডার আসরে পানীয়র খোঁজ করছে। পশ্চিম দুনিয়াতে কফি সেই চাহিদা কিছুটা মেটাতে পারলেও সেখানেও কফির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন উঠেছে। অন্য দিকে, চা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণাপত্রে এর নানা ভেষজ গুণ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। তিন রকমের চা এখন বাজারে ব্যবহার করা হয়— ১) সিটিসি, ২) অর্থোডক্স এবং ৩) গ্রিন টি। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, তিনরকম চায়ের মধ্যেই আছে নানা উপকারী উপাদান। Journal of the Science of Food and Agriculture-এ চায়ের ১৬৯টি ওষধি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রিন টি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'Useful in freating severe addoninal intestinal and cerebral haemorrhage, nephrities, chronic hepatitis, hypertesion, reheumatism and after roselerosis prevents formation of stones in the urinary bladder, liver snd kidneys.'

এ ছাড়া National Institute of Chemistry in LJUBLJANA SLOVENIA-তে বলা হয়েছে, গ্রিন টি-তে যে Catechins আছে তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাকটেরিয়াল এনজাইম DNA GYRASE। এই ব্যাকটেরিয়াল এনজাইমটি একাধিক ওষুধ উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদান (সূত্র 'চা জানা অজানা', রাম অবতার শর্মা)।

একই সূত্রে জানা যায়, কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান হাসপাতালের বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স কালো চা বা ব্ল্যাক টি-এর উপর তাদের গবেষণায় জানিয়েছে, এই চা হাইপারটেনশন ও কেরিব্রোভাসফুল রোগের প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। এখন তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে চিকিৎসকরাই চা-পানের পরামর্শ দিয়ে বলছেন, 'You need three cups of tea to strokers at by.' এ ক্ষেত্রে যেটা বলা দরকার, চা নিয়ে এই গবেষণা কিন্তু চা-মালিকের কোনও সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হয়নি। ফলে বলা যাবে না, চা উৎপাদকরা চায়ের প্রচারের জন্য এই ধরনের তথ্য প্রকাশ করছে। এই পরীক্ষার অন্যতম ব্যবস্থাপক ছিল ন্যাশনাল টি রিসার্চ ফাউন্ডেশন (NTRF) এবং ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপেন্ট যৌথভাবে। তাদের অবশ্য পরামর্শ, চা দুধ, চিনি মিশিয়ে পান না করার, কারণ এতে চায়ের ভেষজ গুণ খর্ব হয়।

চায়ের এই ভেষজ গুণের পরিচয় বৃদ্ধির সঙ্গে চায়ের ব্যবহারের পরিমাণও কিন্তু দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, বিশেষ করে গ্রিন টি-র ব্যবহার বৃদ্ধির হার চমকপ্রদ। এর ব্যবহার ২৩ শতাংশ থেকে ৩৯ শতাংশে পৌঁছে গেলেও সিটিসি'র ব্যবহার কিন্তু ৪৪ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে নেমে এসেছে ২৭ শতাংশে। অপর দিকে, অর্থোডক্স চায়ের চাহিদা প্রায় একই থেকে গিয়েছে।

এই তথ্যে দেখা যাচ্ছে, মাঝেমধ্যেই চা-শিল্পে গেল গেল যে রব উঠছে, তার কোনও জোরালো যুক্তি নেই। বরং বলা হচ্ছে, সারা পৃথিবী জুড়ে চায়ের চাহিদা যেভাবে বৃদ্ধি

পাচ্ছে, তাতে যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে প্রতিযোগিতায় চা-শিল্পে পুরনো প্রযুক্তির পরিবর্তে আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভারতের চা-সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে যত পরিমাণ জমিতে চা চাষ হয়, তার ১৭ শতাংশ ভারতে। পৃথিবীর মোট চা উৎপাদনের ২৫ শতাংশ উৎপন্ন হয় ভারতে। এই পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন এবং আয়তনের প্রশ্নে ভারতের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়। তবে রপ্তানির ক্ষেত্রে পৃথিবীর মোট চা রপ্তানির ১০ শতাংশের অংশীদার হয়ে ভারতের বর্তমান স্থান চা রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে চতুর্থ।

এ ক্ষেত্রে আরও একটা জিনিস স্পষ্ট। আন্তর্জাতিক চা-বাজারের চাহিদার তুলনায় জোগানের পরিমাণ কম। এই পার্থক্যের পরিমাণ কিন্তু আগামীতে আরও বৃদ্ধি পাবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। আরও একটা জিনিস জানা দরকার, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং চিন বিদেশে যে দামে চা রপ্তানি করে, সেটা উৎপাদন খরচ থেকে কম। তাই এই দেশগুলি রপ্তানিকারকদের ভরতুকি দেয়। এর উদ্দেশ্য যে বিদেশি মুদ্রা অর্জন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক চা-বাজারে বাৎসরিক রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ থাকলেও এর কতখানি ভারত নিতে পারবে তা নির্ভর করবে চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নেবে, তার উপর।

এ দেশের চা উৎপাদন ও রপ্তানি

চা-বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতে যে সমস্যাটা দেখা যাচ্ছে, তাতে দেখা যায়, দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে চায়ের চাহিদার হার ৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন হার ২ শতাংশের মতো। ফলে দেশের বাজারের চাহিদা মিটিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট পরিমাণ রপ্তানিযোগ্য চা জোগান দিতে পারছে না। ১৯৬০ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের অংশ ছিল ৩৬ শতাংশ, ১৯৯১ সালে সেটা নেমে দাঁড়ায় ২২ শতাংশ। প্রশ্ন এখানেই। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারে বিপুল চাহিদা মেটাবার ক্ষেত্রে বিপুল ঘাটতি থাকলেও চা-বাগিচা শিল্প নিয়ে কেন এমন সংকটের কথা বলা হচ্ছে? চটকলের ক্ষেত্রে একটা যুক্তি হাজির করা যায়, কারণ পাটজাত শিল্পের চাহিদা ঘরে ও বাইরে কৃত্রিম তন্তুর দাপটে কোণঠাসা হয়ে পড়ায় এই শিল্প গভীর সংকটে পড়েছে। এ কথা তো চা নিয়ে বলা যায় না। কারণ, চায়ের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তবে কেন চা নিয়ে এই সংকট? চাহিদা মেটাতে সারা পৃথিবীর চা উৎপাদনকারী দেশগুলি তাদের চা-বাগিচায় নানা আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। অথচ ভারতের চা উৎপাদকরা টিকে থাকতে চাইছে চিরাচরিত অবস্থানেই। চা যে একটা শিল্প এবং সমগ্র ব্যবস্থাকে শিল্পের দৃষ্টিতেই দেখা প্রয়োজন— এই সরল সত্যটি তারা মনে রাখতে চায় না। বরং চা শিল্প হিসেবে ব্রিটিশ শাসনকালে যাত্রা শুরু করে দেশি মালিকানাধীনে আসার পর বহু ক্ষেত্রেই বানিয়া মনোভাবই প্রধান হয়ে দেখা দিল। ফলে যেনতেন প্রকারে মুখ্য হয়ে দাঁড়াল মুনাফা। শিল্পের প্রয়োজনে মূলধন বিনিয়োগের গুরুত্ব হ্রাস পেতে শুরু করল।

অন্য দিকে, অনেক পরে শুরু করে বহু দেশ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের থেকে এগিয়ে গেল। এটা খতিয়ে দেখার দরকার ছিল, কিন্তু তার কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ভারতে হেক্টরপ্রতি ১৬৪০ কেজি চা উৎপন্ন হয়। সেখানে তুরকিস্তান ও কেনিয়াতে এই পরিমাণ যথাক্রমে ২০৩৩ এবং ১৭৫৫ কেজি। উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের মধ্যেও উৎপাদন পরিমাণের ক্ষেত্রে আছে পার্থক্য। উত্তর ভারতে যেখানে এই উৎপাদনের হার হেক্টরপ্রতি ১৬০০ কেজি,

ডুয়ার্সের চা-বাগিচার মালিকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, চা-বাগিচা গভীর সংকটে। আন্তর্জাতিক ও দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে চায়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা কিন্তু সেই আশঙ্কাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে দেয় না। বিশ্ব কৃষি সংস্থার সূত্রে জানা যায়, বিশ্বে চা-পানকারীর সংখ্যা ভারতেই সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে, ভারতে কিন্তু চা-শিল্পের তথ্য ও প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের সব উপাদানই মজুত আছে।

সেখানে দক্ষিণ ভারতে ২০০০ কেজি।

টি বোর্ড সূত্রে জানা যায়, বিগত শতকের পাঁচের দশকে ভারতের মোট চা উৎপাদনের ৩৬.৩ শতাংশ ব্যবহৃত হত দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে। নয়ের দশকে দেশের বাজারে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৭০ শতাংশ। দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের এই চাহিদা বৃদ্ধির হারকে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন ছিল আধুনিক প্রযুক্তির, পুরনো চা-গাছের পরিবর্তে নতুন চারাগাছ রোপণ এবং বৃহৎ চা-বাগিচার নিকটবর্তী জমি উদ্ধার করে ক্ষুদ্র উৎপাদকদের চা-বাগিচা স্থাপনে সাহায্য করা। টি বোর্ড তাদের ৮ম পরিকল্পনার কর্মসূচিতে জানিয়েছিল, আন্তর্জাতিক বাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে ভারতের চা উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে বায়োটেকনোলজি ও আধুনিক কৃষি গবেষণার উপর অধিক জোর দেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের ঘ্রাণে বিভিন্ন গন্ধ, যেমন— লেবু, গোলাপ, সুগন্ধি জলপাই, দারচিনি ইত্যাদি আনতে যে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই তথ্য মাথায় রেখে ভারতের চা উৎপাদকদেরও যে কার্যকরী উদ্যোগ নেওয়া উচিত ছিল, তার তাগিদ দেখা যায়নি।

আধুনিকীকরণে সায় নেই মালিকের

চায়ে আছে ২০-৩০ শতাংশ পলিফেনল, ৪-৫ শতাংশ ক্যাফিন, ২-৪ শতাংশ অ্যামিনো অ্যাসিড, ২-৪ শতাংশ চিনি, ৪-৮ শতাংশ লিপিড, ০.৫ শতাংশ পিগমেন্ট, ১৬ শতাংশ প্রোটিন, ৫ শতাংশ খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি। সংক্ষেপে বলা যায়, এক কাপ চায়ে প্রায় ৫০০ রকমের নানা রাসায়নিক বিভিন্ন অনুপাতে থাকে। এগুলির উপর নির্ভর করে চায়ের স্বাদ ও গন্ধ। এর অনুপাত নির্ভর করে স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশের উপর। এর জন্য দরকার নিবিড় গবেষণা। কারণ, চা-বাগিচার মতো প্রতিটি বাগিচাজাত দ্রব্য বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান সামগ্রী। সেগুলি হল— কফি, কাজু, নারকেল, দারচিনি, এলাচ, মশলা, কলা, রাবার, কোকো, সুগন্ধি এবং ভেষজ গাছ ইত্যাদি। এর জন্য জোরহাটের টোকলাই গবেষণাকেন্দ্র এবং দক্ষিণ ভারতের চা-গবেষণাকেন্দ্র UPASI। যৌথভাবে যাতে গবেষণার উদ্যোগ নেয়, তার জন্য The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) বিশেষ কর্মসূচি নিতে পারে।

মনে রাখতে হবে, চা-শিল্পর জন্য বহু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ঘটেছে ভারতেই। যেমন রোটেরভেন, কন্টিনিউয়াস লিফ কন্ডিশনার, টি রোলার, ট্রে ড্রায়ারার, কন্টিনিউয়াস উইদার মেশিন, সিটিসি স্ক্রিন ইত্যাদি। চায়ের উৎপাদনশীলতা তার গুণমান নিরপেক্ষ হতে পারে না। তাই চা উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুণমান শুধু বজায় রাখা নয়, তাকে আরও উন্নতির জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে যন্ত্রপাতি আধুনিকীকরণের গবেষণা জোরদার করা প্রয়োজন ছিল। এ কথা বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে সেই উদ্যোগের অভাবের ফল ভারতের চা-শিল্প বাণিজ্যের উপর গভীরভাবে পড়েছে। বিশেষ করে চায়ের ঘ্রাণের উপর এর জনপ্রিয়তা অনেকটাই নির্ভর করে। পৃথিবীর অন্য চা-উৎপাদক দেশগুলি চায়ে নানা আকর্ষণীয় ঘ্রাণ আনার জন্য নানারকম গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। এর জন্য দরকার চা উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে এনজাইম বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি। ভারত এখন অবশ্য এ ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে শুরু করেছে। তবে প্রতিযোগিতার দৌড়ে একবার অন্যেরা যদি অনেকটা এগিয়ে থাকে, তবে সেই দৌড়ে ওইসব প্রতিযোগীর টপকে যাওয়া একেবারে অসম্ভব না হলেও খুবই কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন ক্রমাগত গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদন কাঠামোর উন্নতি। চায়ের গুণগতমান নির্ধারণ ও তা বজায় রাখার জন্য দরকার চা-পাতার আর্দ্রতার সঠিক পরিমাণ এর উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে উপযুক্ত যন্ত্রপাতির। তাই সেই পরিমাণ যত নির্ভুলভাবে মাপা যাবে, চায়ের গুণগতমান ততই উন্নত হবে। একই সঙ্গে চায়ের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য এর জ্বালানি তথা শক্তি সংরক্ষণের প্রশ্নটিও গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখা দরকার। বর্তমানে আমাদের দেশে ১ কেজি কালো চা উৎপাদনের জন্য ০.৪ থেকে ০.৫ কিলোওয়াট/ঘণ্টা অথবা ১.২ থেকে ১.৬ কেজি কয়লা বা ০.৪ থেকে ০.৭ লিটার ফার্নেস অয়েল লাগে। অন্য চা উৎপাদক দেশগুলি এ ক্ষেত্রে এই শক্তি খরচের হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করেছে। যে উদ্যোগ এ দেশে নেওয়া হয়নি।

ভারতে কিন্তু চা-শিল্পের তথ্য ও প্রযুক্তির আধুনিকীকরণের সব উপাদানই মজুত আছে। কিন্তু আসাম-বাংলার চা-বাগিচা তথা চা-শিল্প শতাব্দীর বেশি প্রাচীন হলেও আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। অথচ এখানেই দানাদার (CTC) চা উৎপাদন ও তার জন্য প্রয়োজনীয় রোটারভেন, অক্সিডাইজড চা শুকানোর জন্য এফবিডি ইত্যাদির পর আর কোনও উন্নত যন্ত্র আবিষ্কার হল না।

বিশ্বায়নের এই প্রতিযোগী বাজারে টিকে থাকতে হেক্টরপ্রতি জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধি, চা-গাছের রক্ষণাবেক্ষণ, কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে গাছ ও তার পাতাকে রক্ষা করা, আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে চায়ের মান বৃদ্ধি করা ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়নি— এই অভিযোগও একশো শতাংশ ঠিক নয়। ভারতের টোকলাই এক্সপেরিমেন্টাল স্টেশন (TES) পৃথিবীর প্রাচীনতম চা-গবেষণাকেন্দ্র। এখানে চায়ের বিষয়ে আছে গবেষণাব্যবস্থা। এদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য সারা দেশে আছে ৬টি পরামর্শকেন্দ্র। এইসব কেন্দ্রেই থাকার কথা চা-বৈজ্ঞানিকদের। এর শাখা আছে আপার আসামের চা-বাগিচার জন্য ডিকামো পরামর্শকেন্দ্র, উত্তর উপত্যকার চা-বাগিচার জন্য ঠাকুরবাড়ি, আসামের কাছাড় এলাকার চা-বাগিচার জন্য শিলচর পরামর্শকেন্দ্র, এ ছাড়া দার্জিলিং ও ডুয়ার্সের চা-বাগিচার জন্য একটি দার্জিলিং ও অপরটি ডুয়ার্সের নাগরাকাটায় একটি করে পরামর্শকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে চা-বাগিচার প্রসার অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। তামিলনাড়ুর ভলপরাইতে স্থাপিত হয়েছে উপোসি চা গবেষণাকেন্দ্র। এ ছাড়া বেঙ্গালুরুতে বাগিচা পরিচালনার উপর গবেষণা তথা শিক্ষাদানের জন্য স্থাপিত হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব প্ল্যান্টেশন ম্যানেজমেন্ট।

চা-সংকটে মালিক-ব্রোকার আঁতাঁত

একটা কথা চা-বাগিচা, বিশেষ করে ডুয়ার্সের চা-বাগিচার মালিকদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, চা-বাগিচা গভীর সংকটে। আন্তর্জাতিক ও দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে চায়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা কিন্তু সেই আশঙ্কাকে সত্যি বলে বিশ্বাস করতে দেয় না। বিশ্ব কৃষি সংস্থার সূত্রে জানা যায়, বিশ্বে চা-পানকারীর সংখ্যা ভারতেই সবচেয়ে বেশি। এই সংস্থার মতে, ভারতে ২০১৯ সালে চায়ের উৎপাদনের পরিমাণ হবে ১.২ মিলিয়ন টন আর দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হবে ১০০ মিলিয়ন টন। অর্থাৎ দেশের চাহিদা মিটিয়ে ভারত আন্তর্জাতিক বাজারে ২০০ মিলিয়ন

কেজি চা রপ্তানি করতে পারবে। ওই সময়ে বাংলাদেশের চা ব্যবহারের পরিমাণ হবে ৬৮,০০০ টন, ভিয়েতনামে ৩৬,০০০ টন, চিনে ৩১,০০০ টন, শ্রীলঙ্কায় ২৯,০০০ টন এবং ইন্দোনেশিয়ায় ২৮,০০০ টন। আর এই সময়ে রাশিয়ায় চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ১,৭০,০০০ টন, ব্রিটেনে ১,৪১,০০০ টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১,২০,০০০ টন, মিশরে ১,১৬,০০০, ইরানে ১,০২,০০০ টন এবং আরব আমিরশাহিতে ৭৩,০০০ টন। এই সূত্রেই বলা হয়েছে, কালো চায়ের রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়াবে ১.৪৯ মিলিয়ন টন। এর সিংহভাগই যাবে এশিয়া থেকে। তাহলে চা-শিল্পের ভবিষ্যতের আকাশে কালো মেঘ কোথায়? উজ্জ্বল আকাশের সম্ভাবনাই তো প্রবল। অথচ বলা হচ্ছে, চা-বাগানে এক ভয়ংকর সংকট ঘনিয়ে এসেছে।

চায়ের মূল্য কিন্তু সারা বিশ্বে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সঙ্গে এর চাহিদাও। বিশ্ব-খাদ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের গড় দাম ছিল প্রতি কেজি ১.৯৫ ডলার। ২০০৮ ও ২০১০ সালে সেটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ২.৩৯ মার্কিন ডলার এবং ৩.১৮ মার্কিন ডলার। ২০০৩ সালে ভারতে চা উৎপাদনের মোট পরিমাণ দেখানো হয়েছিল ৪,৭৩,৩৭০ টন। গড় দাম বলা হয়েছিল ৫৬.২৭ টাকা। তার মানে সে দিন একটা আতঙ্কের ঢেউ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল চা-বাগানে। এই হিসেবের মধ্যেও ছিল কারচুপি। তবে সে দিন যে চা-শিল্পের কোনও সংকট দেখা দেয়নি, সে কথাও বলা চলে না। কারণ, ২০০৫ সালে চায়ের দাম নিলামে নেমে এসেছিল গড় হিসেবে প্রতি কেজি ৫৮.৬৭ টাকা। এই দাম সাধারণভাবে চায়ের উৎপাদন খরচ থেকে যে কম ছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে এখানেও থেকে গিয়েছে কিছু প্রশ্ন। চায়ের এই দাম বলা হয়েছে নিলামকেন্দ্রের হিসেব থেকে। অথচ এক বিরাট পরিমাণ চা যে সরাসরি বিদেশে রপ্তানি ও প্রাইভেট বিক্রি হয়ে যায়, তাকে এই হিসেবের মধ্যে আনা হয়নি। এ ছাড়া নিলামকেন্দ্রেও আছে নানা কারচুপি। সেখানে দাম নিয়ন্ত্রণ করে কয়েকটি বৃহৎ টি ব্রোকারস প্রতিষ্ঠান। সেখানেও ওই সিন্ডিকেট ও চা-মালিকদের আগাম বন্দোবস্তের বোঝাপড়া। চায়ের দাম নিলামে যাবার আগেই মালিক ও সিন্ডিকেটের মধ্যে একটা গোপন বোঝাপড়া হয়ে যায়। এতে লাভ হয় মালিক ও টি ব্রোকারদের। নিলামের দরের অতিরিক্ত অর্থ মালিকের কাছে যাকে বলে 'আন্ডার টেবল ডিল'-এর মাধ্যমে পৌঁছে যায়। এতে ব্রোকার এবং মালিকদের 'এক্সাইজ ডিউটি' ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ ঘটে। মালিকের ঘরে ঢোকে কালো টাকা অথচ চা-বাগানকে ক্ষতির তালিকায় ঢুকিয়ে শেয়ারহোল্ডারদের ডিভিডেন্ট যেমন ফাঁকি দেওয়া যায়, তেমনই শ্রমিকদের প্রাপ্য অর্থ এই ক্ষতির অজুহাতে বকেয়া রাখা যায় বা আত্মসাৎ করা যায়।

শুধু আন্তর্জাতিক বাজারেই নয়, ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারেও এখন চা-প্রেমিকদের কাছে প্যাকেট ও ইনস্ট্যান্ট চায়ের চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলির সিংহভাগই আসে না চা নিলামকেন্দ্রে। ফলে এর দামও পরিমাণের সঠিক তথ্য অনেকটাই অজানা থেকে যায়। তবু তথ্যসূত্রে জানা যায়, ২০০৫ সালেই ভারত থেকে বিদেশে প্যাকেট টি রপ্তানি হয়েছিল ৩৭,০৯১ টন। গড় দাম ছিল ৯০.৩৭ টাকা। পরের বছর শুধু উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, এর দাম বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল প্রতি কেজি ১০৪.৫৭ টাকা।

দেখা যাচ্ছে, চা-বাগানের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণে যেমন কারচুপি দেখানোর সুযোগ থাকছে, তেমনই প্রকৃত বিক্রয়মূল্যের ক্ষেত্রেও বিশাল কারচুপির সুযোগ রয়েছে। টেবিলের তলায় যে আর্থিক লেনদেন হয়, তার উপর অন্ধকার নেমে আসায় তা চলে যায় কালো টাকার গহ্বরে। তাই যে প্রশ্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠে আসছে— চা উৎপাদকরা কেন চা নিলামকেন্দ্রে তাঁদের চা পাঠাতে উৎসাহী হচ্ছেন না, তার কারণ বুঝতে নিশ্চয় অসুবিধা হচ্ছে না।

চা-শিল্পের ভবিষ্যৎ

চায়ের বাজারে যেভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে চা উৎপাদক দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তাতে এটাই স্পষ্ট, চায়ের আন্তর্জাতিক বাজারে নানা দেশ প্রবেশ করতে চাইছে। ১৯৯০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক চা কমিটির পক্ষ থেকে চা-আবাদি জমি বৃদ্ধির যে পরিসংখ্যান দেওয়া হল, তাতে একটা স্পষ্ট ছবি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

চা উৎপাদনকারী দেশের নাম	চা-আবাদি জমি হেক্টর	
	১৯৯০	২০০৮
ভারত	৪,১৬,২৬৯	৫,৭৯,৩৩৭
শ্রীলঙ্কা	২,২১,৭৫৮	১,১৮,৩২৩
ইন্দোনেশিয়া	১,৩৪,৯৩৪	১,৩২,৪৩৯
বাংলাদেশ	৪৭,৬৫০	৫৪,১০৬
নেপাল	—	১৬,৫৯৪
তাইওয়ান	২৪,৩১৫	১৫,৭৪৪
জাপান	৫৮,৫০০	৪৭,৫০০
ইরান	৩২,০০০	১৮,০০০
মালয়েশিয়া	২,৫১৩	৩,৩০০
ভিয়েতনাম	৫৯,৯০০	১,৩১,৪৮৭
কেনিয়া	৯৭,০২০	১,৫৭,৭২০
উগান্ডা	২০,৯০৫	২৩,৮০০
তানজানিয়া	১৮,৮৭৫	২২,৭২২
মালবি	১৮,২০৪	১৮,৬০০
জিম্বাবোয়ে	৬,৩৩৭	৬,০০০
তারকি	৯০,৫৭৫	৭৮,০০০
আর্জেন্টিনা	৪১,২৭৬	৩৮,০০০
ব্রাজিল	৫,০০০	৫,৩০০
পাপুয়া	—	
নিউগুনিয়া	—	১৮,৪৯,৪৯৪

এটা পরিষ্কার যে, সারা পৃথিবী জুড়ে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে চা চাষের জমির আয়তনও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। FAO তাদের সমীক্ষা রিপোর্টে জানিয়েছে, ২০১৯ সাল নাগাদ সারা বিশ্বে কালো চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির হার হবে ২ শতাংশ। এর মোট উৎপাদন দাঁড়াবে তিন মিলিয়ন টনের মতো। এই প্রতিবেদনে ভারতের পক্ষেও আশার কথা শোনানো হয়েছে। ওই সময়ে ভারতে কালো চা উৎপাদনের পরিমাণ ১.২ মিলিয়ন টন হয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম কালো চায়ের উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে। একই সঙ্গে ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়ে এক মিলিয়ন টনের সীমা ছাড়াবে। বলা হয়েছে, চায়ের চাহিদা মেটাতে ভারতকে

তার চায়ের উৎপাদন ১২০০ মিলিয়ন লক্ষ্যকে অতিক্রম করতে হবে। তার মানে ভারতকে প্রায় ১০০০ মিলিয়ন কেজি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রশ্ন উঠেছে, চায়ের চাহিদা মেটাতে এই উৎপাদন বৃদ্ধি কীভাবে ঘটানো যেতে পারে।

চা-শিল্পে কালো মেঘ কতখানি সত্যি তা যেমন দেখার প্রয়োজন আছে, তেমনি সংকটের কালো মেঘ যদি সত্যিই আকাশে জমা হতে থাকে, তবে তার প্রতিকার বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা কী? ডুয়ার্সের চা-বাগান বন্ধ তো বটেই, এমনকি যে দার্জিলিং চা-বাগানের চা আন্তর্জাতিক বাজারে ৩৬,০০০ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি হয়, সেই দার্জিলিং পাহাড়ে কেন চা-বাগান বন্ধ হওয়ার মতো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটছে, তার কারণ ও নিরাময়ের উপায়গুলি খোঁজা দরকার।

২০০৪ সালে ভারতে উৎপন্ন কৃষিপণ্যের মধ্যে প্রথম দার্জিলিং চা Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act-এর আওতায় নথিভুক্ত হয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং চায়ের এই সুনামকে অপব্যবহার করে যখন আন্তর্জাতিক বাজারে লক্ষ লক্ষ ভেজাল দার্জিলিং চা ছেয়ে গিয়েছে, তখন দার্জিলিং নথিভুক্ত চা-কে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিষ্ঠা করার বিরাট সুযোগ এসে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে যেমন ইতালির অলিভ অয়েল-এর সুনামকে ব্যবহার করে অন্য কিছুকে ইতালির অলিভ অয়েল বা ওই জাতীয় বলে হাজির করা যায় না, তেমনই জিআই অ্যাক্টে দার্জিলিং চা নথিভুক্ত হওয়ার পর অন্য কোনও দেশে বা এলাকায় উৎপন্ন চা দার্জিলিং বা ওই শ্রেণির চা বলে বাজারে না পৌঁছালেও ঘুরপথে সেই কাজটি করা হচ্ছে।

কেনিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশের চা যেমন আনা হচ্ছে ভারতে, অন্য দিকে দার্জিলিং চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে প্যাকেটজাত করে দার্জিলিং ব্র্যান্ড বলে আন্তর্জাতিক বাজারে পাঠানো হচ্ছে। সরকার জানে, টি বোর্ডের কর্মকর্তাদের কাছেও এই ভেজাল কারবার অজানা নেই। তারা সব জেনেও চুপ করে থাকে। শক্তিশালী 'টি' লবির রাজনৈতিক ক্ষমতার কাছে তারা বহু ক্ষেত্রেই মাথা নিচু করে থাকতে বাধ্য হয়। এখানেই দায়িত্ব ছিল ট্রেড ইউনিয়নের। একমাত্র শ্রমিকরাই জানে কীভাবে চা-বাগিচার রন্ধ্রে রন্ধ্রে এইসব দুর্নীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। চা-বাগিচা তথা শিল্পকে বাঁচাতে তাই চা শ্রমিকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। চা-বাগিচা বাঁচলে তবেই বাঁচানো যাবে অর্থনীতি তথা চা-সমাজ। শ্রমিকরাও রক্ষা পাবে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে। দূর হবে চা-শিল্পের উপর ঘনিয়ে আসা কৃত্রিম সংকট।

সৌমেন নাগ

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাওয়াইয়ে ডুয়ার্সের বন্ধ চা-বাগানের অসুখ সারবে কি?

ডুয়ার্সসহ উত্তরবঙ্গের চা-বাগিচার জ্বলন্ত সমস্যা— কবে বন্ধ বাগান খুলবে? নেতা-আমলা-শ্রমিক-মন্ত্রীদের ম্যারাথন বৈঠক যখন বন্ধ ও অচল চা-বাগানের সমস্যা মেটাতে কোনও দিশা দেখতে পারল না, তখন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ সমাধানের পদক্ষেপ হিসেবে দিলেন চার দাওয়াই। এ কথা ঠিকই যে বন্ধ বাগানের শ্রমিকরা অনুদান চায় না। বন্ধ বাগানে ফের কাজ শুরু হোক— এটাই তাদের দাবি। সেইমতো মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রথম দাওয়াই হল, কোনও বাগান বন্ধ হলেই সেটি চালু করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। তার মানে

প্রথমেই বুঝতে হবে, চা-বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর আমরা আজকাল ঘন ঘন পাচ্ছি তা আসলে কি 'ক্লোজার' নাকি লক আউট? সাধারণত বাগান বন্ধ হয় দু'টি কারণে। এক, ধর্মঘট; দুই, ক্লোজার, লকআউট, সাসপেনশন অব ওয়ার্কের মাধ্যমে। ধর্মঘটের কারণে চা-বাগান বন্ধ হলে তা হয় কিছুদিনের জন্য। অর্থাৎ বন্ধ বাগান ঘিরে যে ছবিটা সবার মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, তার সঙ্গে ধর্মঘট বিষয়টির যোগাযোগ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোনওভাবেই নেই। চা-বাগান বন্ধ মানে মালিকপক্ষ থেকেই বন্ধ করে রাখা। বুঝতে অসুবিধা নেই এই যে, রোগটি সাম্প্রতিক ডুয়ার্সের চা-বাগিচাক্ষেত্রে ক্রমশ মহামারী আকার নিচ্ছে, সেই রোগটি মূলত মালিকপক্ষের তৈরি। যদিও এই বন্ধেরও আবার দু'টি ধরন আছে। এক, ক্লোজার ঘোষণা করে দেওয়া। মানে কোনও বাগান স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু সেটা করতে গেলে সরকারের অনুমতি দরকার হয়, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয় ইত্যাদি। কোনও চা-বাগান মালিকই এই পথে সরাসরি চলেননি বা চলছেন না। বরং তাঁরা অন্য ধরনটিই অবলম্বন করেছেন বা দু'নম্বর পথেই চলছেন। সাসপেনশন অব ওয়ার্ক, লক আউট। প্রোডাকশন বন্ধ করে দিলে বাগানটি অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়। আর এতে মালিকপক্ষ আইনের দিক থেকে নিস্তার পেয়ে যায়। অস্থায়ীভাবে বন্ধ চা-বাগান মাস পেরিয়ে বছর, তারপর বেশ কয়েকটি বছর পার করে দিলে তা আসলে স্থায়ী বন্ধের রূপ নেয়।

এইভাবে চা-বাগান বন্ধের ফলে শ্রমিকরা হারাচ্ছে কাজ, মজুরি এবং নানা প্রাপ্য অধিকার। বাগান বন্ধ থাকার জন্য প্রতিদিন মরছে শ্রমিক আর তার পরিবারের সদস্য অনাহারে-অর্ধাহারে অপুষ্টিজনিত রোগব্যাধিতে। যারা মরছে না, তারা খিদের জ্বালায় ছুটছে। অনশন ছেড়ে অন্যত্র। আর কিছুদিনের মধ্যেই প্রান্তিক মানুষে পরিণত হচ্ছে তারা। কেউ কেউ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে অন্য পথ। আসল সত্য হল, কোনও কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে বাগান বন্ধ ঘোষণা করেননি, মালিক কেবল বাগানটিকে অচল করে রেখেছে, কিন্তু তার অনেক আগে মালিক বুড়ো চা-গাছের পরিবর্তে নতুন গাছ লাগায়নি, চা উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তির ধারকাছ দিয়েও হাঁটেনি। কারণ, যাতে বাগানটিকে রুগ্‌ণ প্রমাণ করা যায়। আর সেটা প্রমাণ করতে মালিক আর সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যায়, যাতে বিআইএফআর-সহ অন্যান্য সংস্থা থেকে যথাসম্ভব টাকা আদায় করা যায়। যদিও চা-বাগান মালিকদের এ জাতীয় একাধিক প্রস্তাব এখন ঝুলে রয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞ মানুষ মাত্রেই জানেন, মালিকপক্ষের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অস্থায়ীভাবে বন্ধ চা-বাগান রুগ্‌ণ প্রমাণিত হলেও 'মিকা' (১৯৮৭) অনুসারে বিআইএফআরএ'তেও যদি যায় তাহলেও বাগান পুনরুজ্জীবনের জন্য চলবে অন্তহীন শুনানি। পাঁচ-দশ বছর পেরিয়ে হয়ত নতুন যুগ চলে আসবে, কিন্তু বাগান পুনর্গঠনের কোনও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা তৈরি হবে না। ততদিনে চা-বাগানের শ্রমিক থেকে শুরু করে উৎপাদনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা মানুষ মরবে পঙ্গপালের মতো। আর

চা-বাগান নিলামের জটিল প্রক্রিয়া জেনে-বুঝে উঠতেই লেগে যাবে অনন্তকাল। তাতে শ্রমিকরা কিছু পেতেও পারে, আবার না-ও পেতে পারে। আর থাকে একটি প্রক্রিয়া— ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে কারখানাকে নিলামে পাঠানো। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অভিযোগ আনতে হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল চলে দীর্ঘকালব্যাপী।

মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বন্ধ বাগান চালু করতে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন টি বোর্ড ও রাজ্য সরকারকে যৌথভাবে। যদিও টি বোর্ড-এর ভূমিকা যে ঠিক কী তা নিয়ে চা-শ্রমিক থেকে শুরু করে চা-মহলের বৃহদংশেরই কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে এটাও বোঝা গেল না যে, দীর্ঘ সাত ঘণ্টা বৈঠকে টি বোর্ডের ভূমিকাকে ঠুঁটো জগন্নাথের মতো এ কথা বলার পরও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সেই বোর্ডের উপর আস্থা রাখেন কোন ভিত্তিতে? মানতেই হয়, বন্ধ ও অচল চা-বাগানে একের পর এক মৃত্যু ঘটনায় বিধানসভা ভোটের আগে প্রবল চাপে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীসহ রাজ্য সরকার। তাই নিয়ম করে তারা কেন্দ্র সরকারের কোর্টে বল ঠেলে দিচ্ছে। ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিরুদ্ধে কোনওরকম সুর না চড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যৌথ দায়িত্ব রাখলেন টি বোর্ড ও রাজ্য সরকারকে বাগান খোলার দাওয়াই হিসেবে! দাওয়াই অনুযায়ী রাজ্য সরকার ও টি বোর্ড যৌথভাবে কোনও সংস্থাকে ডেকে বাগান চালানোরও ব্যবস্থা করতে বলবে। ওই সংস্থা চুক্তি মারফত সাময়িকভাবে বাগান চালানোর ভার পাবে, কিন্তু তাদের উপর বর্তাবে না বকেয়ার ভার। প্রশ্ন হল, রুগ্‌ণ বা বন্ধ বাগানের ভার কাউকে ডেকে এনে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায়? বা কাজটা কি এতই সহজ? প্রক্রিয়া কিংবা আইনি জটিলতার প্রশ্নগুলি যদি সরিয়েও রাখা যায় তাহলেও কি এমন কাউকে পাওয়া যাবে, যিনি এই হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দেবেন? কোন স্বার্থেই বা দেবেন? বাগান পরিচালনভার নেবেন একজন আর শ্রমিকদের বকেয়া মেটানোর জন্য চাপ দেবে রাজ্য সরকার আর টি বোর্ড— এ জাতীয় প্রস্তাব কিংবা সমস্যা মেটানোর দাওয়াই কি খুব একটা যুক্তিযুক্ত? শ্রমিকরা তো কাজে নেমেই বকেয়ার দাবি তুলবে। তা ছাড়া দীর্ঘ দিনের বন্ধ বাগান চালু করে লাভের মুখ দেখাটাও তো সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া। ততদিনে নতুন-পুরনো মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে বকেয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব নতুন সমস্যা তৈরি করে ফেলবে। আর রাজ্য সরকার যে আইনের জটিলতায় বাগান অধিগ্রহণের পথে পা বাড়াবে না কিংবা জনগণের টাকায় বাগান মালিকের আর্থিক দায় মেটাতে যাবে না তা বলাই বাহুল্য। তাহলে যৌথ উদ্যোগে কোনও বাগান বন্ধ হলেই কীভাবে সেটি চালু করার ব্যবস্থা সম্ভব? তবে কি ডুয়ার্সের চা-বাগান বাঁচাতে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর এক নম্বর দাওয়াই কোনও কাজই করবে না? মরণাপন্ন চা-বাগান শ্রমিক থেকে শুরু করে সমগ্র ডুয়ার্সবাসী আরও একটু ধৈর্য ধরুন। যদিও প্রায় অসম্ভব প্রক্রিয়া, তবুও অনেক সময় ইন্দ্রজালের মায়ায় সক্রিয় হয়ে ওঠে নিষ্প্রভ প্রাণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, বিগত ২০১৫-র ১৬ মে প্রতিমন্ত্রী রেড ব্যাঙ্ক চা-বাগান পরিদর্শন করেছিলেন। ১৭ মে সব পক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন শিলিগুড়িতে। ওই বাগানটি কিন্তু এখনও খোলেনি। এবারও তিনি বান্দাপানিসহ আরও দু'টি বন্ধ চা-বাগান পরিদর্শন করেছেন। চা-বাগান শ্রমিকদের মুখ থেকে সরাসরিই তাঁদের দুর্দশার কথা শুনেছেন। বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের বাঁচাতে শিলিগুড়ির বৈঠকেই মন্ত্রী শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চালু করতে রাজ্য সরকারকে উদ্যোগী হতে বলেন। পাশাপাশি শ্রমিকদের ১২২ টাকা মজুরি, তার সঙ্গে চাল-গমসহ মোট ১০৯ টাকা মূল্যের যে সুবিধা তা নগদে দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু মন্ত্রীর ওই দাওয়াই চা-বাগান শ্রমিকদের একাংশ মেনে নিলেও অধিকাংশ চা-শ্রমিকরা এতে ঘোর আপত্তি জানান। তাঁরা ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ২৫০ টাকা করার দাবি জানিয়ে সরব হন। প্রসঙ্গত বলা ভাল, চালু বাগানের শ্রমিকরা যাঁরা এখনও ওই ১২২ টাকা পাচ্ছেন বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নামমাত্র হলেও পাচ্ছেন, তাঁরাই কিন্তু ন্যূনতম মজুরি ২৫০ টাকা করার দাবি তোলেন। বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা তো বহুকালই রোজগারবিহীন। আর কতদিন যে এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে তাঁদের থাকতে হবে, সেটাও আজ আর হিসেব করার মতো অবস্থা নেই কারও। এখানেও বলা দরকার, চা-শ্রমিকদের এই দাবি দীর্ঘ দিনের। তাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রস্তাব, চা-শ্রমিকদের একাংশের মেনে নেওয়া কিংবা বৃহদংশের না মানা বিষয়টি কোনওভাবেই শ্রমিক ঐক্য বা অনৈক্যের প্রশ্ন নয়। সেটি একেবারেই তাৎক্ষণিক। তবে দীর্ঘদিন ধরে চা-শ্রমিকরা ১২২ টাকা মজুরিতে ঘাম ঝরাচ্ছেন। বহু সময় সেই প্রাপ্যটুকু থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হয়েছেন। তাই এ ক্ষেত্রে একটা আশঙ্কা অতি সামান্য হলেও থেকে যাচ্ছে। ডুয়ার্সের চা-বাগানের জ্বলন্ত সমস্যা বাগান বাঁচিয়ে রাখা এবং শ্রমিকদের মৃত্যুমিছিল প্রতিরোধ করা। চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা যদি এখন মূল সমস্যা থেকে সরে গিয়ে ন্যূনতম মজুরিকে আন্দোলনের অভিমুখ করেন, তবে তো বাগান মালিকদের পোয়াবারো। আর রাজ্য সরকারের হাত ধুয়ে ফেলার রাস্তাও পরিষ্কার হয়ে যায়।

বান্দাপানি চা-বাগান পরিদর্শনের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চা-বাগান শ্রমিকদের দুরবস্থা যে কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, তা নিজের চোখেই দেখেছেন। ডুয়ার্সের বন্ধ ও অচল চা-বাগানের শ্রমিকরাই তাঁকে অনাহারে মৃত্যুর কথা জোর দিয়ে বলেছেন। মাননীয় মন্ত্রী তাঁদের মুখেই শুনেছেন, চৈত্র-বৈশাখ মাসে ওদের জলের একমাত্র ভরসা ৬ কিমি দূরের পাহাড়ি ঝোরা, সেটাও ডলোমাইটে ভরা। বান্দাপানির মহিলা চা-শ্রমিকই তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছে, ১৫০০ টাকা সরকারি অনুদানে কি এত বড় সংসার চলে? শুধু তো ভুখা পেট নয়, পানীয় জলও অমিল। অন্ত্যোদয় অন্নপূর্ণা যোজনায় সপ্তাহে শ্রমিকপিছু আধ কিলো গম, ১ কিলো চাল, ১০০ গ্রাম চিনি আর ১০০ গ্রাম কেরোসিন তেল পেতে লাগে আট টাকা। ১০ টাকা দিলে ২ টাকা ফেরতের বদলে দুটো দেশলাই গছিয়ে দেয়। এ কথাও তো মন্ত্রী শুনেছেন চা-শ্রমিকের মুখেই। ওই বন্ধ বাগানেরই ক্ষুব্ধ যুব শ্রমিক সপাটে মন্ত্রীকে বলেছে, ম্যাডাম, আমরা ভিখারি নই। দান-খয়রাতিতে নয়, কাজ করে বাঁচতে চাই। কিছু একটা করুন। ডুয়ার্সের বন্ধ অচল চা-বাগানের ছবি যে মাননীয় মন্ত্রীকে গভীরভাবে ছুঁয়েছে, সে ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন নেই। আর সে কারণেই তিনি বাগান বাঁচানোর দাওয়াইতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রতিটি জেলায় মনিটরিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। ওই কমিটি বন্ধ চা-বাগানের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে, কোনও চালু চা-বাগান বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে কমিটিই কেন্দ্রকে জানাবে। চা-পর্ষদ, রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ওই কমিটি আদৌ কি গঠিত হয়েছে? জানা নেই। তবে কোনও মনিটরিং যে ডুয়ার্সের চা-বাগানগুলিতে নবপর্যায়ে শুরু হয়নি, সে কথা বলাই যায়।

ডুয়ার্সের চা-বাগান পরিস্থিতি, ডুয়ার্সের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রই জানেন একভাবে। পাশাপাশি চা-বাগানে দীর্ঘদিন জড়িয়ে থাকা শ্রমিক-কর্মচারীরাও জানেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। আর রাজনীতি করা, ট্রেড ইউনিয়ন করা মানুষজনরা চা-বাগান পরিস্থিতিকে জানেন-বোঝেন রাজনৈতিক স্বার্থেই। আজ আর নতুন করে মনিটরিং কমিটি কেন্দ্রকে কী খবর দেবে, কী-ই বা জানাবে! ডুয়ার্সের বন্ধ অচল চা-বাগানের দৈন্যদশা কি কারও কাছে অজানা রয়ে গিয়েছে? তা ছাড়া প্রতিমন্ত্রী তো স্বচক্ষেই দেখলেন সাম্প্রতিক হাল। তা না হলে কী করে তিনি বললেন, কেন্দ্রীয় চা-আইন বদল করতে হবে?

তপন মল্লিক চৌধুরী

ছিটবাসীরা রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে উৎখাত হলেও নজর ছিল না কারও

ছিটমহল বিনিময়ের যুক্তি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে প্রতিষ্ঠা করতেই কি কৌশলে ছিটমহল বিষয়টিকে বাজারজাত করা! যেন ছিটমহল বিনিময় হলেই সব সমস্যার মাধান। ছিটমহলবাসীদের বুকের যন্ত্রণাকে আড়াল করাটাই যদি লক্ষ্য হয়, তবে সেটা এক ধরনের ষড়যন্ত্র। ছিট-কথার সেই অধ্যায় নিয়ে **অষ্টম পর্ব**

২৭ অক্টোবর ২০১০, ছিটবাসীদের লং মার্চ বাংলাদেশ সীমার মধ্যে ভারতীয় ছিটমহল অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও প্রকৃত ছিটবাসীরা যে সংঘবদ্ধ হতে পারে তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলকেও বিচলিত করে তোলে। বিশেষ করে লালমণিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলা এলাকায়। বিএনপি ও জামাত শিবির নিয়ন্ত্রিত জোংরা ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তারা 'ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি'কে সামনে রেখে এক-কথায় যুদ্ধ ঘোষণা করে ভারতীয় ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের বিরুদ্ধে। যে কোনও মূল্যে ভারতপন্থী ছিটবাসীদের শায়েস্তা করাই তাদের লক্ষ্য। ছিটবাসীদের হাতে ভারতের পতাকা এবং মুখে 'বন্দে মাতরম্', 'ভারতমাতা কি জয়' স্লোগান তাদের না-পসন্দ। অতএব 'ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি'কে সামনে রেখে শুরু হল নতুন খেলা। সঙ্গে একটি মুখরোচক স্লোগান, 'দ্রুত ছিটমহল বিনিময় চাই।' আপাতদৃষ্টিতে এই স্লোগান মনোগ্রাহী হলেও এর পেছনে যে রয়েছে একটি কূট চাল ও চক্রান্ত এবং সেই সঙ্গে প্রকৃত ছিটমহলবাসীদের অব্যক্ত যন্ত্রণা ও চোখের জল, তার খবর রাখে ক'জন?

যা-ই হোক, দ্রুত ছিটমহল বিনিময়ের দাবিতে এবার নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করে 'ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটি'। ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে তারা সমস্ত ভারতীয় ছিটমহলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার আহ্বান জানায়। অর্থাৎ এক-কথায় ভারতের সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানো। ছিটমহলগুলিতে চলতে থাকে এর সপক্ষে প্রচার। সঙ্গে অবশ্যই রক্তচক্ষু ও ভয়ভীতি প্রদর্শন। সেই সঙ্গে বাংলাদেশ প্রশাসনের একাংশের প্রত্যক্ষ মদত। কী করবে অসহায় ছিটমহলবাসীরা? অসম জীবনযুদ্ধে অসহায় মানুষরা একে একে নিজেদের নিষ্ক্রিয়তার জালে আবদ্ধ করতে শুরু করে। এমনকি ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের সভাপতি মোজাহারুল ইসলাম সংগঠন ত্যাগ করেন। কিন্তু লড়াই জারি রাখেন বলরাম বর্মন।

ছিটমহল ইউনাইটেড কাউন্সিলের নতুন সভাপতি হন গোলাম মতিন রুমি। সীমিত ক্ষমতা নিয়ে লড়াই চালাতে থাকে সংগঠনের অন্য সদস্যরা। বিনিময়ে কমিটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশের বিজয় দিবসে (১৬ ডিসেম্বর) বলরাম বর্মনের উদ্দেশে ১১২ নং বাঁশকাটা ছিটমহলে বাংলাদেশি পতাকা উত্তোলন করবার ফতোয়া জারি করা হয়। ফতোয়া অস্বীকার করেন বলরাম বর্মন। শুরু হয় বলরাম বর্মনকে শায়েস্তা করার ষড়যন্ত্র। আসরে নামেন বিএনপি ও জামাত শিবিরের স্থানীয় কেউকেটারা। আর সবকিছু জেনে-বুঝেও নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন করে ভারতের সীমান্তরক্ষীবাহিনী। কারণ, সীমান্ত পেরনোর কোনও পরোয়ানা যে তাদের হাতে নেই।

১৪ ডিসেম্বর ২০১০। নিশুতি অন্ধকার রাতে চারদিক নিস্তব্ধ। অঘ্রানের সেই শীতকাতর রাতে ছিটবাসীরাও জবুথবু। কাঁথা-কম্বলের মুড়িতে চলছে ঘুমানোর প্রস্তুতি। হঠাৎ রাতের অন্ধকার চিরে একদল উন্মত্ত মানুষের পৈশাচিক চিৎকার। গগনভেদী চিৎকারে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য। এক-কথায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। প্রথমে সকলের ধারণা যে ছিটে ডাকাত পড়েছে। সংবিৎ ফিরতেই সকলের নজর গিয়ে পড়ল বলরাম বর্মনের বাসগৃহে। প্রায় শ'তিনেক উন্মত্ত জনতার আক্রমণে বিধ্বস্ত বলরাম বর্মনের বাড়ি। প্রাণ হাত নিয়ে সপরিবার বলরাম বর্মন অন্ধকারে বাড়ি ছেড়ে রওনা দিয়েছেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ। বলরাম বর্মনের স্ত্রী স্বপ্না বর্মনের কথায়, প্রায় তিনশত সশস্ত্র বিএনপি-জামাত মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের আচম্বিতে হামলা। নেতৃত্বে জোংরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, বিএনপি দলের শাহীন হোসেন ও ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির লালমণির জেলা শাখার সভাপতি বকুল মিয়া। প্রাণ বাঁচাতে তাঁরা রাতের অন্ধকারে বাড়ি থেকে পালিয়ে নিকটবর্তী নবিনগর বিডিআর ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যের হল, ওই নারকীয় আক্রমণের কথা শুনেও বাংলাদেশ রাইফেলস-এর জওয়ানরা কোনওরকম সহায়তা বলরামবাবুর পরিবারকে সে দিন দেয়নি। অগত্যা সপরিবার বলরাম বর্মন আত্মগোপন করতে বাধ্য হন।

বলরামবাবুর বাড়িতে ওই ধরনের হামলা ভারতীয় ছিটমহলবাসীদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। ছিটমহলগুলির অন্দরে তৈরি হয় এক ভীতির পরিবেশ। তবু ওই আতঙ্কঘন পরিবেশেই বৈঠকের পর এ বিষয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। ওই বছরই দু'দেশ সমীক্ষা, লোকগণনা এবং স্বরাষ্ট্র ও বিদেশমন্ত্রকের কর্তাদের নিয়ে গঠিত যৌথ দলকে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম, লালমণিরহাট, নীলফামারি ও পঞ্চগড় এবং ভারতের কোচবিহার জেলার মধ্যে থাকা ৫১টি ছিটমহলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়।

কিন্তু যে বিষয়টি সকলের নজর এড়িয়ে যায় তা হল, ছিটমহল বিনিময়ের মতো একটি জনপ্রিয় স্লোগানকে সামনে রেখে আন্দোলনরত ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির মুখোশের আড়ালে থাকা গোপন অভিসন্ধি। ২০০২ সালে বিএনপি-জামাত সরকারের শাসন আমলে বাংলাদেশের মাটিতে জন্ম নেওয়া এই সংগঠন যে আসলে বাংলাদেশের ভূমিদস্যু ও মৌলবাদী শক্তির মদতপুষ্ট সংগঠন, সেটা আপাতদৃষ্টিতে অধরাই থেকে যায়। ১৯৭৪ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির রূপায়ণ কিংবা ছিটমহল বিনিময় যাদের মুখের সর্বসময়ের বাণী। তা ছাড়া দুই দেশের সরকারের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে যারা স্লোগান তোলে, তাদের সম্পর্কে সন্দেহ আসবেই বা কেন? কিন্তু ১৯৭৪ সালের পর বাংলাদেশের পদ্মা-মেঘনা কিংবা ভারতের তিস্তা-করতোয়া কিংবা ধরলা-নীলকুমার দিয়ে যে বহু জল প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে, ভারতের রাজনৈতিক মহল সেই ব্যাপারে ছিল একদমই উদাসীন।

বাংলাদেশি দখলদাররা সে দেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের সুযোগ নিয়ে একের পর এক প্রকৃত ছিটবাসীদের যে উৎখাত করে চলেছে, সেদিকে কারও কোনও নজর ছিল না। উত্তরবঙ্গের চোপড়া থেকে শুরু করে আঠারঘাই, মাটিগাড়া, সুকনা-শালবাড়ি,

একতিয়াশাল, ফুলবাড়ি, খট্টিমারি, লাটাগুড়ি, হলদিবাড়ি, সাতকুড়া-মানিকগঞ্জ, কুচলিবাড়ি, শিকারপর, কুর্শাহাট, জটেশ্বর ইত্যাদি ছোট-বড় গঞ্জ বা জনপদ যে বহু ভারতীয় ছিটমহলবাসীকে কোলে টেনে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছে, তার হিসেব রাখে ক'জন? ছিটমহল বিনিময় হলে সকল সমস্যার সমাধান— এই বক্তব্যকে খুব সুচারুভাবে বাজারজাত (পড়ুন মার্কেটিং) করে প্রকৃত ছিটমহলবাসীদের বুকের যন্ত্রণাকে আড়াল করার এক নগ্ন প্রয়াস। বলা যেতে পারে, এটা এক ধরনের সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের একটি অধ্যায়মাত্র। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে ছিটমহল বিনিময়ের যৌক্তিকতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেই যেন সুকৌশলে ছিটমহল বিষয়টিকে বাজারজাত করা হয়েছে। বলা হল, এই ছিটমহলগুলি নাকি সৃষ্টি হয়েছে কোচবিহার ও রঙ্গপুরের রাজাদের 'High Stake Game' বা জুয়া কিংবা পাশা খেলার বাজি ধরার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ছিট সৃষ্টির ইতিহাসের উৎস হিসেবে এই তত্ত্বের বাস্তবতা কতটা? এই ইতিহাসের উৎস কী কিংবা কোচবিহার রাজ্যের কোন রাজার সঙ্গে রঙ্গপুরের রাজার এই খেলা হয়েছিল? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।

উত্তর থাকবেই বা কোথা থেকে, কারণ এসবই যে বানানো গল্প। খুব সুচারুভাবে এই গল্পের আমদানি হয়েছে। সেই সঙ্গে পরিবেশনও করা হয়েছে অতীব চমকপ্রদভাবে। কারণ একটাই, ছিটমহল সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে লঘু করে দেখানোই যে তাদের লক্ষ্য। এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক মহলে বিষয়টিকে 'ঠুনকো' করে দেওয়ার এ এক কৌশল। বলা ভাল, ষড়যন্ত্রবিশেষ। সেই সঙ্গে এটাও বহুল প্রচারিত যে, ভারতবর্ষের দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতার সময় কোচবিহারের রাজা ভারতে এবং রঙ্গপুরের রাজা পাকিস্তানে যোগ দেবার কারণে এই সমস্ত ছিটমহলের সৃষ্টি। অথচ স্বাধীনতার পরে কয়েক দশক অতিক্রান্ত, কিন্তু আজকের ভারত কিংবা বাংলাদেশের ছিটমহল নামক ভূখণ্ডের ইতিহাসের প্রকৃত অনুসন্ধান বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে সেভাবে দেখা গেল না। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কেউ প্রশ্ন করল না রংপুরে রাজা কে ছিলেন কিংবা প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে রংপুর কি আলাদা রাজ্য ছিল? আমরা সবাই জানি, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে রংপুর ছিল ব্রিটিশশাসিত বাংলার একটি জেলামাত্র। রংপুর নামক জেলা আত্মপ্রকাশ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত ধরে। অথচ প্রকৃত ইতিহাসকে চাপা দিতে এই আষাঢ়ে গল্প এমনভাবে বাজারজাত করা হল, যাতে সেটাই হয়ে উঠল ছিট সৃষ্টির ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য। যদিও প্রকৃত ইতিহাস একেবারেই ভিন্ন। এই ইতিহাস রাজওয়ারা ও মোগলায়নের ইতিহাস।

দেবব্রত চাকী

(ক্রমশ)

লেখা ছবি পাঠাতে চান?

ডুয়ার্স সম্পর্কিত যে কোনও বিষয়ে লেখা বা ছবি পাঠাতে পারেন। তবে তা মনোনীত হল কিনা কিংবা কবে ছাপা হবে তা জানানো হয় যদি সেটি প্রকাশিত তবে তার আগে, ফোন বা মেল করে তা জানা যাবে না। এক্ষেত্রে লেখা বা ছবি ছাপা হলে সৌজন্য সংখ্যা পাঠাবার কোনও ব্যবস্থা নেই। কেবলমাত্র আমন্ত্রিত লেখা বা ছবির ক্ষেত্রেই সাম্মানিক দক্ষিণা দেওয়া হয়ে থাকে। লেখা/ছবি পাঠাতে পারেন ই-মেল বা ডাক যোগে কিংবা হাতে হাতেও।

E-mail: ekhonduars@yahoo.com

ঠিকানা- মুক্তাভবন, মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি ৭৩৫১০১

বাড়িতে বসে 'এখন ডুয়ার্স' চাইছেন?

জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার শহরে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সেক্ষেত্রে যিনি আপনাকে পত্রিকা পৌঁছে দেবেন তাঁর হাতে পত্রিকার দাম দিয়ে দিতে হবে, নতুবা পরের সংখ্যাটি পৌঁছনো সম্ভব হবে না। এককালীন ২৫০ টাকা পাঠিয়েও এক বছরের সবকটি সংখ্যা বাড়িতে বসে পেতে পারেন। A/C Payee Cheque 'Ekhonduars' নামে কিংবা ক্যাশেও টাকা পাঠানো যায়। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন দেবজ্যোতিকে ৯৮৩০৪১০৮০৮ নম্বরে।

তক্কাতক্কি

'প্রেম' নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এ কি শুধুই শরীরসর্বস্ব একটি খেলা, যেখানে মনের স্থান থাকতেও পারে, না-ও পারে, নাকি মনের বীণার তারেই বাজে প্রেমের প্রথম ঝংকার, যার কম্পন বিস্তৃত হয় শরীরের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে? আপনার মতামত জানান। অনধিক ২০০ শব্দে আমাদের লিখে পাঠান আপনার নাম-ঠিকানাসহ এই ঠিকানায়— **'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে এখন ডুয়ার্স, মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১।**

মেঘ পিয়োন

মনের ভিতর এমন অনেক কথা জমে উঠছে, যা আপনি কাউকে বলতে পারছেন না। এমনকি বলতে না পেরে কোনও কাজে মন দিতে পারছেন না, অস্থিরতা বাড়ছে। এমন যদি হয়, আমাদের কাছে অনায়াসে শেয়ার করুন। প্রয়োজনে নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলে, তাও গোপন রাখা হবে। লেখাটি যেন ২০০ শব্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। পাঠান এই ঠিকানায়— **'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে এখন ডুয়ার্স, মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১।**

শোক

জলপাইগুড়ির 'অনুভব' হোম নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল 'এখন ডুয়ার্স' ১ জানুয়ারি ২০১৬ সংখ্যায়। এই সংখ্যায় ওই হোমেরই একটি দুঃখজনক ঘটনা জানাতে হচ্ছে বলে আমরা সকলেই অত্যন্ত মর্মাহত। ৩১ ডিসেম্বর 'অনুভব'-এর মেয়েদের জন্মদিন উপলক্ষে ২ জানুয়ারি তাঁরা কয়েকজন বেড়াতে গিয়েছিলেন মংপুতে। ফেরার পথে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান সুনন্দা মুখোপাধ্যায় এবং গৌরী চোধুরী। ওঁরা দু'জনেই যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে। ওঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

বাম-কংগ্রেস জোট হলে উত্তরবঙ্গে অস্বস্তিতে পড়বে তৃণমূল?

২০০৯ এর লোকসভা নির্বাচনের পর এই প্রথম তৃণমূলের ভোটে জেতার পথ ততটা মসৃণ দেখাচ্ছে না। তৃণমূল সুপ্রিমোর জয় রথের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে চলেছে উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা। বাম-কংগ্রেস জোট হলে উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলা ও মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ার একটি ক্ষুদ্র অংশের মোট ১০০টি আসনে বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে তৃণমূল কংগ্রেস। এই ১০০টি আসনের মধ্যে ৫৪টি-ই রয়েছে উত্তরবঙ্গে। এই পরিসংখ্যানই হাইকমান্ডের কাছে তুলে ধরেছেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতারা। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরি প্রথমে একলা চলার পথে থাকলেও শেষ পর্যন্ত জোটের পক্ষে সায় দিচ্ছেন, যদিও তিনি বলছেন হাইকমান্ডই শেষ কথা। তিনি দিল্লির নেতৃত্বকে জানিয়েছেন, তৃণমূলের সঙ্গে জোট গড়লে বঙ্গে দলের কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। দলের কর্মীরাও অনেকে চাইছেন মালদা, মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুর বাদ দিয়ে বাকি জেলায় অতীত ভুলে বামেদের সঙ্গে জোট বাঁধতে। সিপিআইএমের রাজ্য সম্পাদকও বামফ্রন্টের শরিকদলের সঙ্গে বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জোটের বিষয়ে বামফ্রন্টের শরিকদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। আরএসপি জোটের পক্ষেই সওয়াল করেছে বলে জানা গিয়েছে। জোট নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নিমরাজি। সরাসরি আপত্তি জানিয়েছে একমাত্র সিপিআই। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধিপত্য কমাতে দুই শিবিরই জোটের অঙ্কে উত্তরবঙ্গকেই ভরসাস্থল হিসেবে দেখছেন।

বাম ও কংগ্রেস শিবিরের নেতারা কেউই অবশ্য জোট হলে মমতা সরকারে ফিরবেন না, এমনটি ভাবছেন না। তাঁদের অঙ্ক হল জোট গড়লে রাজ্যের এবার সব বুথেই এজেন্ট দেওয়া যাবে। কারণ বিহারে সাফল্যের পর পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে যথেষ্ট সিরিয়াস নির্বাচন কমিশন। শোনা যাচ্ছে অবজার্ভার পাঠাবার আগেই গারদের বাইরে থাকা বিচারাধীন অপরাধীদের অন্দরে পাঠানো নিয়ে আরও কড়াকড়ি হবে। দুষ্কৃতীদের দাপট না থাকলে ভোট দেবার সাহস পাবে মানুষ। অর্থাৎ অবাধে ভোট হলে তৃণমূলের আসন সংখ্যা

বা জয়ের ব্যবধান কমিয়ে আনা যেতে পারে বলে জোট সমর্থক মহলের ধারণা।

গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকালে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলায় বাম ও কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোটের হার যোগ করলে তৃণমূল কংগ্রেস বেকায়দায় পড়বে। ওই ফলের নিরিখে উত্তরবঙ্গের ৫৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে ২৬টি-তে। বামফ্রন্ট এগিয়ে রয়েছে ১৮টি-তে। অর্থাৎ, দুই শিবির একে অপরের হাত ধরলে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলকে দূরবিন দিয়ে খুঁজতে হবে বলে বিশ্বাস কং ও বাম দুই শিবিরেই। গত লোকসভা নির্বাচনের ফলের নিরিখে উত্তরবঙ্গে ছয়টি জেলায় বিধানসভাওয়ারি হিসেব দেওয়া হল নিচের সারণীতে। এই সারণীতে চোখ বোলালে উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলায় কে কোথায় দাঁড়িয়ে, সেই ছবিটা স্পষ্ট হবে। উত্তরবঙ্গের ছয় জেলায় গত লোকসভা নির্বাচনের ফলের হিসেবে জেলাওয়ারি কংগ্রেস ও বামেদের সমঝোতা হলে তৃণমূল যে বিপদে পড়তে পারে তা ওপরের সারণি থেকে পরিষ্কার। এর পাশাপাশি, বাম ও কংগ্রেসের জোটপন্থী নেতারা মনে করছেন সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে, তা পূরণ হয়নি। তাই তাঁদের অনুমান তৃণমূলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কেও ফাটল ধরতে পারে। তাঁদের আশা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস জোট হলে সংখ্যালঘুরা নির্ভরযোগ্য বিকল্প পাবে। রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ১২৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে ২০ শতাংশের বেশি সংখ্যালঘু ভোটার রয়েছেন, তার মধ্যে ২৫টি আসন উত্তরবঙ্গে। সত্যিই যদি সংখ্যালঘুদের একাংশ তৃণমূল থেকে মুখ ফেরান তা হলে উত্তরবঙ্গের ওই ২৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল পিছিয়ে পড়তে পারে। আর এই পাটিগণিতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাই এই জোট আটকাতেই নাকি সাম্প্রতিক দিল্লি সফরে ১০ জনপথে গিয়ে সনিয়া গান্ধির সঙ্গে দেখা করে সন্ধির বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, মমতা সনিয়াকে বলেছেন বামেদের সঙ্গে কংগ্রেস যদি জোটে না যায় তাহলে আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত সংসদে কংগ্রেসের পাশে থাকবে তৃণমূল। এই অবস্থায় সনিয়া কী সিদ্ধান্ত নেন, সেদিকেই তাকিয়ে বাম ও কংগ্রেসের জোটপন্থী নেতারা। বিহার নির্বাচনের আগে রাহুল গান্ধি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জোট করার ক্ষেত্রে প্রদেশ কংগ্রেসের দাবিকেই অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করা হবে। সেই মতো লালু-নীতীশের সঙ্গে জোট গড়ে বিজেপিকে হারানো সম্ভব হয়েছে। তাই সেই আশাতেই বুক বাঁধছেন রাজ্যের সিপিএম ও কংগ্রেসের কিছু নেতা।

২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের জেলাওয়ারি ফলাফল (শতাংশ হিসেবে)

জেলা	তৃণমূল	বাম	বিজেপি	কংগ্রেস	অন্যান্য
কোচবিহার	৩৯.৮১	৩৩.৬	১৬.৫৮	৫.৪৮	৪.৫৪
জলপাইগুড়ি	৩৩.৬৪	৩০.০৯	২৩.২৫	৮.৭৪	৪.২৭
উ. দিনাজপুর	২২.১৫	২৮.৮৩	১৭.৮৩	২৫.৫৪	৫.৬৪
দ. দিনাজপুর	৩৭.৮৭	২৯.১৯	২২.৫১	৭.০২	৩.৪২
দার্জিলিং	২৪.৯৫	৩০.০৯	৪৭.৭৩	৬.৬৬	৮.৩৫
মালদা	১৮.২৪	২২.৬৮	১৮.৭৪	৩৪.০৪	৬.৩১

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

জোটে গিয়ে এ রাজ্যের বড় ঘাঁটি উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের লাভ কতটুকু ?

ব্রিগেডে সিপিএমের সাম্প্রতিক জনসভায় মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়বার মতো। শীতের কলকাতা বেড়ানোর সুযোগসন্ধানী বা ময়দানে পিকনিকের মৌতাতে মেতে থাকাদের কথা বাদ দিলেও বহু মানুষ এসেছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকে, যাঁরা পাঁচ বছর শাসকদলের দাপট সহ্য করেও এখনও লাল ঝান্ডা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরবার দুঃসাহস রাখেন (যদিও বিরোধী নেতা ও মিডিয়ার বৃহদংশের মতে এ রাজ্যে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার লুপ্ত হয়েছে, না হলে সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারত)। আসলে সেই বাল্যকাল থেকে এলাকায় 'শাসক' হয়ে বড় হওয়ার দীর্ঘ দিনের অভ্যেস ভেস্তে যাওয়ার পর এদের আর শিবির বদলের সুযোগ হয়নি। এই লোকগুলিকে গত পাঁচটা বছর কোটরে লুকিয়ে থাকার ও মাথা নিচু করে পথ হাঁটার মতো 'অবমাননা' সহ্য করতে হয়েছে। এবার সুযোগ পেতেই পকেটে ঝান্ডা লুকিয়ে এলাকা পার হয়ে কলকাতার রাজপথে এসে প্রতিবাদে প্রাণ খুলে গলা ফাটিয়েছেন নির্বিঘ্নে। এই মানুষগুলি আদপেই নিপীড়িত-শোষিত- কপর্দকহীন নয়, এঁরা আসলে ব্রিগেডের মাঠে নেতাদের কাছে আশার বাণী শুনতে এসেছিলেন, জানতে এসেছিলেন আদৌ এখন কোনও পথ খোলা আছে কি না, যাতে আবার আগের মতোই বুক চিতিয়ে নিজের এলাকায় হাঁটাচলা যায়। কিন্তু জনসভায় এসে তাঁরা হতাশ হয়ে দেখলেন মঞ্চে উপবিষ্ট সেইসব পুরনো নেতার গলায় নেই কোনও জোশ, না আছে লড়াইয়ের আহ্বান, না আছে কোনও নতুন পথের সন্ধান। বড্ড ম্লান মুখে সে দিন ঘরে ফিরতে হয়েছিল মানুষগুলিকে।

আসলে রাজ্যের 'একদা শাসক, এখন শাসিত' শ্রেণির এই মানুষগুলি এতদিনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন, এইসব নেতার আর লড়াইয়ে জেতার ক্ষমতা নেই, বয়সের ভারে আর দাদাগিরি হারাবার শোকে ন্যুব্জ এঁরা। তাই ব্রিগেড ফেরত মানুষগুলিকে এলাকায় চায়ের আড্ডায় নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে একই কথা বলতে শোনা গিয়েছে, 'অন্তত কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধার কথাটুকুও যদি নেতারা খোলাখুলিভাবে বলতেন, তাহলেও অনেকটা চাঙ্গা হওয়া যেত।' কিন্তু সে কথা প্রকাশ্যে বলবে কী করে ভায়া? পালটা যুক্তিতে দাঁড়ান পুরনো 'মোড়ল' কমরেড, 'পার্টি কংগ্রেসে তো জোটের প্রস্তাব নেওয়া হয়নি! আর কেরালায়-ত্রিপুরায় যারা মূল 'শত্রু', তারা এখানে 'বন্ধু' হবে কী করে? মানুষই বা মেনে নেবে কোন যুক্তিতে?' কিন্তু মাথা নাড়লেও মন যে মানতে চায় না কমরেডদের। তাদের শঙ্কা, নিজেদের নেতৃত্বের যখন এই হাল, প্রতিরোধ গড়তে কংগ্রেসকে সঙ্গী করলে ক্ষতি যতটুকু, না করলে যে ক্ষতি তার চেয়ে ঢের বেশি, রীতিমতো অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা।

সত্যি কথা বলতে, আসন্ন বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে এ রাজ্যে গোটা সিপিএম দলের আজ আর একা লড়াইয়ের সাহস নেই। তাই পার্টি কংগ্রেস-প্লেনাম-পলিটব্যুরোর যাবতীয় তাত্ত্বিক কচকচানির বাইরে এসে হাত ধরতে চাইছে কংগ্রেসের, কারণ হাত ধরবার মতো আর কেউ নেই যে! শরিক দলগুলির তীব্র আপত্তি অগ্রাহ্য করে দীর্ঘ দিনের বাম-ঐক্য বিপন্ন করেও আজ এই জোটের কথা ভাবছেন এ রাজ্যের সিপিএম নেতারা। এর থেকেই প্রমাণিত হয়, রাজনৈতিকভাবে কতটা বিপর্যস্ত হলে শাসক তৃণমূলকে যোঝবার এই সহজ পথ খোঁজে দেশের বৃহত্তম বামপন্থী দল!

যদিও জোটের প্রস্তাব বা সম্ভাবনা এখনও মিডিয়ার চর্চাতেই সীমাবদ্ধ, তবু যদি তর্কের খাতিরেই ধরে নিই, আসছে নির্বাচনে কং-বাম লিখিত বা অলিখিত জোট হচ্ছে, তবে তার চিত্র এ রাজ্যের দু'ভাগে দু'রকম হলেও পরিণাম একই রকম অনুমান করা যায়। দক্ষিণবঙ্গের মানুষ যেমন এই খিচুড়ি মেনে নেবে না, তেমনই উত্তরবঙ্গে বাম-শরিক দলগুলির আধিপত্য বেশি থাকায় এই জোট কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। ভোটের অঙ্ক যাঁরা নিয়মিত কষেন, তাঁরা খুব ভাল করেই জানেন, কং-বাম দুইয়ের ভোট যোগ করাটা কখনওই বাস্তবসম্মত নয়, কারণ বহু অ-বাম ভোট সে ক্ষেত্রে তৃণমূলে না গেলেও তৃতীয় বাক্সে পড়বে বা নষ্ট হবে। মিডিয়া উদ্ভূত 'শিলিগুড়ি মডেল' তাই পুর বা পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় বোর্ড গঠনে সফল হলেও এ রাজ্যের সরকার গঠনে যে 'অবাস্তব' তত্ত্ব, সে কথা যে কোনও রাজনীতিসচেতন মানুষই বোঝেন। 'রামধনু জোট' শুনতে বা দেখতে ভাল হলেও রাজ্যের স্বার্থে কোনও দলের কাছেই কাম্য নয়।

জোট নিয়ে প্রকাশ্যে চর্চা হচ্ছে এ রাজ্যের কংগ্রেস শিবিরেও। দলের বৃহত্তর অংশ তৃণমূলি অত্যাচার ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে বাম-দলের সঙ্গে গাটছড়া বাঁধতে আগ্রহী। কংগ্রেস সমর্থকরাও বহু জায়গায় দলের প্রদেশ সভাপতির উপস্থিতিতেও সেই ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। দলের আরেকটি অংশ অবশ্য জোট হলে তৃণমূলের সঙ্গেই হওয়া উচিত নতুবা নয়— এই মনোভাব পোষণ করছেন। তাঁদের যুক্তিও স্পষ্ট, সমর্থক বা নেতারা যা-ই বলুন, কংগ্রেসের বাঁধাধরা ভোটের বেশির ভাগ অংশই বাম-কং জোটের বিরুদ্ধে যাবে। সে যা-ই হোক না কেন, প্রশ্নটা একেবারেই অন্যখানে। বাম বা তৃণমূল যে দলই হোক না কেন, জোটে গিয়ে কংগ্রেসের আখেরে লাভ কতটুকু? দক্ষিণবঙ্গে কংগ্রেসের ভোট গড়ে মাত্র পাঁচ শতাংশ, সেখানে বামের সঙ্গে জোটে গেলে যেটুকু বাড়তি পয়েন্ট আয় হতে পারে তা যাবে বাম-ঝুলিতেই। আবার সেখানে তৃণমূলের সঙ্গে জোটে গেলে সেই পাঁচ শতাংশেও ভাঙন ধরতে পারে। কারণ, দক্ষিণবঙ্গের কংগ্রেস সমর্থকদের সাম্প্রতিক হুমকির কথা মনে রাখতে হবে, প্রয়োজনে সিপিএমে যাব, কিন্তু টিএমসি-জোটে নেই। অতএব রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে যে কোনও জোটেই কংগ্রেসের কোনও সুবিধা হবে না।

উত্তরবঙ্গে সে চিত্র আলাদা, ডুয়ার্স-তরাই-দিনাজপুর-গৌড়বঙ্গে কংগ্রেসের পুরনো ঘাঁটি তৃণমূলি দাপটে এখন যথেষ্ট নড়বড়ে, অনেকটাই অধিকৃত। (যদিও এ-ও জানা কথা

যে, দখলমুক্ত হতেও খুব একটা দেরি হবে না, লোকসভায় কংগ্রেসের সাফল্যই যথেষ্ট, আর এখানে কং-তৃণমূল শিবির নেপাল-ভুটান সীমান্তের মতোই খোলামেলা, আসা-যাওয়া চলে অবাধে।) তবু এখানে কংগ্রেসের ভোট অনেক বেশি, ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ। স্বভাবতই এখানে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধলে বিরোধী পক্ষের ভ্রুকুঞ্চন ঘটবে। সে হিসেবে জোট হলে কংগ্রেসের পক্ষে জেতা আসনগুলিও ধরে রাখা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে সমস্যাটা একটু ভিন্ন। সিপিএমের উদ্যোগে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট হলেও তা সীমাবদ্ধ থাকবে উপরমহলেই, কারণ উত্তরবঙ্গ জুড়ে সিপিএমের চাইতে ছোট ছোট বাম-শরিক দলগুলির এলাকা অনেক বেশি। যদিও সাংগঠনিক ক্ষয় ঘটেছে কমবেশি সব বাম-দলেই, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বাঁধলে শরিক দলের ভোট এবং বাম-বিরোধী কং ভোট— দুইয়েরই বেশির ভাগটাই পড়বে অন্যত্র। ফলত কংগ্রেসের জেতা আসনগুলির ভিতও নড়ে যাবে। একই রকম পরিণাম হওয়ার সম্ভাবনা তৃণমূলের সঙ্গে জোট বাঁধলেও, কংগ্রেসের বহু কর্মী প্রতিবাদে বসে যাবেন। ভোট ভাগ হয়ে চলে যাবে তৃতীয় বাক্সে। অতএব জোট থেকে আলাদা করে পাওয়ার কিছু অন্তত কংগ্রেসের জন্য নেই।

তবে এসবই আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজ নেওয়ার মতোই অনধিকার চর্চা। আসল খেলা বা অঙ্ক কষা হবে দিল্লিতে। মমতার সঙ্গে হাসি-শুভেচ্ছা বিনিময় হলেও এখনও একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি কংগ্রেস হাইকমান্ড। তেমনই পশ্চিমবঙ্গে বামেদের সঙ্গে যাওয়ার ন্যূনতম ইঙ্গিতও মেলেনি রাহুল-সোনিয়ার কাছ থেকে। এআইসিসি'র চালু প্র্যাকটিস অনুযায়ী অনুমান করলে লোকসভা নির্বাচন ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় সম্ভবত খুব একটা তাঁদের নেই। সিনিয়র এক কংগ্রেসি নেতার সাম্প্রতিক মন্তব্য অত্যন্ত দামি মনে হল— 'মমতা কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে আদৌ ভাবছেন না, বরং বাম আর কংগ্রেস যাতে কাছাকাছি না আসে, সে নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা অনেক বেশি। সে জন্যই টুকটাক মৈত্রীর বার্তা পাঠাচ্ছেন কংগ্রেসের দপ্তরে, যাতে সিপিএম তফাতে থাকে।' সোনিয়া-রাহুলও যে প্রত্যুত্তরে মৈত্রীর ইঙ্গিত দিচ্ছেন না একেবারেই তা নয়, কিন্তু তার পেছনে লোকসভায় বিজেপি বিরোধিতার অঙ্কই বেশি কাজ করছে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন নয়। আর সত্যি কথা বলতে, বাম বা তৃণমূল দুইয়ের সঙ্গে জোটের পুরনো ঘা এখনও শুকায়নি। এত তাড়াতাড়ি শুকানোর কথাও নয়, তা সে ঘা যতই 'রাজনৈতিক' হোক না কেন!

খুচরো ডুয়ার্স

বিড়ির সঙ্গে ফ্ল্যাট ফ্রি

শুরু বছর চারেক আগে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। তার পর এই ২০১৪ তেই কড়া মাপের গোটা তিনেক। আর '১৫ পড়তে না পড়তেই আরেক দফা। ভূমিকম্পের আকস্মিক ফূর্তির কারণে বহুতলে ফ্ল্যাট বাগিয়ে যারা নিশ্চিন্তে দিন গুজরান করছিলেন, ঝাঁকুনি আর দুলুনির ঠ্যালায় তাঁদের ঘুম উধাও! প্রায় তিন যুগ শীতঘুমে থাকার কারণে অনেক প্রোমোটারই বুঝেছিলেন যে ডুয়ার্সে আর ওসব হবে না। ফলে বহুতলে ফ্ল্যাট কিনতে দু-বার চিন্তা করেননি ডুয়ার্সের বাসিন্দার একটা অংশ। কিন্তু প্রকৃতি বোধহয় প্রোমোটারদের থেকে ভাগা না পেয়ে চটেছেন। একটি করে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন আর হু হু করে কমছে ফ্ল্যাট বাড়ির চাহিদা আর দাম।

এই সব দেখে বিজ্ঞজনেরা বলছেন, ফ্ল্যাটবাড়ি এর পর বিড়ির সঙ্গে ফ্রি দেবে আর কুঁড়ে ঘরের স্কোয়ার ইঞ্চির 'প্রাইস' হবে হাজার দশেক।

টাকার নদী

কে জানি বলেছিলেন না টাকা মাটি, মাটি টাকা? সে মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে ডুয়ার্সের হরেক নদী থেকে ইচ্ছে মতো মাটি কেটে টাকা বানাতে কিছু লোক তাই ব্যাকুল হয়ে পড়েছে। নদী পেলেই পাড় থেকে খচাখচ মাটি কাটিয়ে ট্রাক ভরতি করে কোথায় পাঠাচ্ছে তা ভগবানই জানেন! এদিকে খাতের মাটি হারিয়ে নদী তট নিজেই দিবারাত্রী তটস্থ! এই বুঝি পাড় গেল উড়ে। আসন্ন বর্ষায় হিমালয় থেকে যখন গ্যালন গ্যালন ঠান্ডা ঠান্ডা পানি নেমে আসবে তখন পাড়ের কী দশা হবে ভেবে দেখেছেন? পাড়ের ওপাড়ে থাকা গাঁ গঞ্জ শহরের কী দুর্ভোগ হবে মালুম আছে?

ধুত্তোর! দেকচেন তো কাজ করে খাচ্ছি! ফালতো ভয় দেখাচ্চেন কেন বলুন তো? তিন শব্দের সরকারের মাঝে মাটি দেকচেন না? তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, রায়ডাক, ডিমা, লিস, ঘিস... নদীর পাড়ের প্রতি পরমাণু মাটিতে মানুষের অধিকার হরণ কত্তে চাইচেন নাকি?

চোৎসব

শুনতে খারাপ লাগছে? এটা আসলে চা আর উৎসবের স্বরসন্ধি।

২০১৫ সালেই বন্ধ চা বাগানের সাড়ে তিনশোর বেশি শ্রমিক অপুষ্টিতে ভুগে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কোহিনূর, ডিমডিমা, মধু, রেডব্যাংক, পানিঘাটা, গংগারাম, বীরপাড়া, হান্টাপাড়া, কিলকোট, বাগরাকোট... না মশাই! এসব টুরিস্ট স্পট নয় গো! এ হল সেই সব বাগানের নাম যেখানে মরেচে ওরা। আরও আছে। এই অবস্থায় কালচিনিতে চা উৎসব। ভাল ভাল! চা খেয়ে উৎসব হোক। সেটা বন্ধ থাকা মধু চা বাগানের নাকের ডগাতেই হোক। পরের বার বন্ধ বাগানের ভেতরে করার আবদার জানাই। পটল তোলার অপেক্ষায় থাকা তুশ্চু 'লেবার' না হয়ে কটা মুহূর্ত উৎসবে মত্ত থাকুক। মরণকালে উৎসব নাম নিলে স্বর্গলাভ গ্যারান্টি।

সত্যি?

জলপাইগুড়ি বিশ্ববাংলা ক্রীড়াঙ্গনে টেবিল টেনিস-এর কোচিং ব্যবস্থা করেছেন সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর। সাধু উদ্যোগ! কিন্তু কানাঘুষোয় জানা গেল কোচের বেতন নাকি মেরে কেটে দেড়-দু'হাজার! রসিকজন অবশ্য বলেছে যে ওটা ১৯১৫ সালের পে স্কেল মেনে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমরাও তাই ভাবছি।

আপনার ছেলে বা মেয়ে কি এবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে?

এবার মাধ্যমিক অনেকটাই আগে! ভোটের ছুটোছুটি বোর্ডের পরীক্ষার রুটিনেও! আপনার মেয়ে বা ছেলে কি জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষায় বসছে? আর তো মোটে ক'টা দিন। ওর পাশে থাকুন খুব ভালবাসায়। প্রথমেই নজর রাখুন ওর শরীরের দিকে। বেচারির অনেক চাপ, টেনশন। ওকে বলুন ভয় নেই, সব ভাল হবে। সুস্থ থেকে ঠান্ডা মাথায় পরীক্ষা দিলে নম্বর ঠিকঠাক আসবে। 'এখন ডুয়ার্স' ওদের পাশে আছে। রইল মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যে অফুরান শুভেচ্ছা আর ডুয়ার্সের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের এক গুচ্ছ টিপস্।

১) ভাল নম্বর পাওয়ার প্রথম ধাপ হল ঠিকঠাক প্রশ্ন নির্বাচন ও সঠিকভাবে উপস্থাপন। যেখানে প্রশ্ন বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে সেখানে স্কোরিং প্রশ্নটি এবং যেটি উত্তর দিতে স্বচ্ছন্দ তা বেছে নিতে হবে।

২) খাতা পাওয়ার পর স্কেল দিয়ে পেনসিলে ভাল করে মার্জিন টানা প্রয়োজন। মার্জিনের বাঁ পাশে প্রশ্নের নম্বর ঠিক ভাবে লিখতে হবে।

৩) উত্তরপত্র লেখার সময় কালো অথবা নীল কালি ব্যবহার করাই যুক্তযুক্ত। এই দুই কালিতেই পয়েন্টস্ ও লেখার ফারাক তৈরি করলে দেখতে ভাল লাগবে। পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কাটাকুটি না করাই উচিত।

৪) বানান যতটা নির্ভুল করা যায় ততই ভাল।

৫) অপ্রয়োজনীয় বেশি না লিখে টু-দ্য-পয়েন্ট লিখতে হবে। প্রশ্নের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট বাক্য সংখ্যায় উত্তর লিখতে চেষ্টা করতে হবে।

৬) বাংলায় বেশি নম্বর পাওয়ার ক্ষেত্রে ২/৩ নম্বরের প্রশ্ন ও ব্যাকরণের উত্তর যেন ভুল না হয় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

৭) যে বিভাগের উত্তর (ক/খ/গ) লেখা শুরু করবে তা এক জায়গায় শেষ করতে পারলে ভাল হয়, এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে উত্তর না লেখাই ভাল।

৮) বাংলায় কবি ও কবিতার নাম কিংবা গদ্যাংশ ও লেখকের নাম বাধ্যতামূলক নয়। যেখানে উৎস জানতে চাওয়া হবে সেখানেই দিতে হবে। (যেমন টীকার ক্ষেত্রে)। প্রবন্ধ রচনা সবশেষে লেখাই ভাল।

৯) গণিতে যে কোনও সূত্র বিবৃত করতে বলা হলে সূত্রটি লিখেই শেষ করলে হয় না, গাণিতিক ব্যাখ্যাটিও লেখা আবশ্যক।

১০) গাণিতিক সমীকরণ লিখলে ব্যবহৃত প্রতীক চিহ্নগুলির পরিচয় দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

১১) দুটি রাশির পার্থক্য লেখার সময় রাশি দুটির পরিচয় দিয়েই প্রথম পার্থক্যটি শুরু করলে উত্তরের মান অনেক উন্নত হয়।

১২) আলোকচিত্র অঙ্কন করার সময় সঠিক তিরচিহ্ন ব্যবহার করতে যেন ভুল না হয়।

১৩) গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাশিগুলি একই পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে এবং কাঙ্খিত উত্তরটি যদি এককযুক্ত রাশি হয় তবে একক লিখতে কোনওভাবেই যেন ভুল না হয়।

১৪) ভৌতবিজ্ঞানে গ্যাস প্রস্তুতি সম্পর্কিত প্রশ্নে যতটা লেখা প্রয়োজন ততটাই লিখতে হবে। যেমন— নীতি, শমিত সমীকরণ চাইলে শুধুমাত্র নীতি, শমিত সমীকরণই লিখবে, অযথা বর্ণনা লেখার প্রয়োজন নেই।

১৫) যে উত্তর জানা নেই তা নিয়ে মনগড়া কিছু লিখে খাতা ভরতি না করাই শ্রেয়।

১৬) জীবনবিজ্ঞানে পেনসিলে ছবি আঁকতে হবে, আঁকার ক্ষেত্রে ওভার-রাইটিং যেন না হয়। যে জিনিসটি চিহ্নিত করা হচ্ছে সেটি যেন স্পষ্ট বোঝা যায়।

১৭) বিজ্ঞানসম্মত নাম লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই আন্ডারলাইন করে দিতে হবে।

১৮) ইতিহাসের ক্ষেত্রে সিলেবাস পুরোটা আয়ত্তে থাকা প্রয়োজন। সাল-তারিখের দিকে যত্ন নিয়ে নজর দিতে হবে।

১৯) ইতিহাসে ম্যাপ পয়েন্টিং করতে চাইলে টেস্ট পেপারের প্রশ্নগুলোর জায়গাগুলি আয়ত্তে আনলে অবশ্যই কমোন পাওয়া যাবে।

২০) ইতিহাসের বড় প্রশ্নের উত্তরে পরীক্ষার্থীর মূল্যায়ণ নিজের ভাষার অবশ্যই সুন্দর করে লিখতে হবে।

২১) প্রাকৃতিক ভূগোলে চিত্র না চাইলেও প্রযোজ্য হলে চিত্র দেওয়া যেতে পারে।

২২) ভূগোলে ম্যাপ পয়েন্টিং-এ উপযুক্ত জায়গায় চিহ্ন সহ নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

২৩) ভূগোলে পার্থক্য চাইলে কিছু পয়েন্ট বেশি দেওয়া ভাল।

২৪) সিন আনসিন উভয় ক্ষেত্রেই ইংরেজিতে একাধিকবার মন দিয়ে পড়া উচিত।

২৫) ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে সহজভাবে পয়েন্ট মাথায় রেখে লিখতে হবে। উত্তরপত্রের নির্ধারিত জায়গাতেই লেখা উচিত, আলাদা সিট ব্যবহার না করাই ভাল।

টিপস্ দিয়েছেন ডুয়ার্সের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক— সুবল চন্দ্র রায়, প্রতুল চন্দ্র রায়, অমৃত কর, কৃষ্ণ চন্দ্র দাস, সমীরণ ভৌমিক ও বিক্রম দাস।

শতবর্ষের গৌরবেও আলোকহীন থাকল রাজ ঐতিহ্যময় কোচবিহার সাহিত্যসভা

সরকারি সাহায্য বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছু মেলে না। তাহলে? আয়ের উৎস বলতে বিভিন্ন সভাসমিতির জন্য সাহিত্যসভার দ্বিতল ভবন ভাড়া দেওয়া হয়। আর রয়েছে সাহিত্যসভার প্রাথমিক স্কুল, যার ভাড়া মাসিক ছ'শো টাকা। এ ছাড়া ডাকঘর ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে ১৩০০ টাকা। তবে রাজ ঐতিহ্যের এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ৩০০ টাকা করে অনুদান দিয়ে আসছে কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড। এ তো গেল অর্থকড়ির দিক। টাকাপয়সা ছাড়া কোনও সংস্থার অস্তিত্বের কথা ভাবা যায় না— এ কথা ঠিক। আর সচল থাকতে গেলে তো অর্থনীতির ভিত মজবুত হতেই হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা একটি সংস্থার পরিচয় নয় কখনওই। তাহলে কোচবিহার সাহিত্যসভা শতবর্ষে পৌঁছাল কীভাবে! ১৯৬৮-র অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই সভা। শুধুমাত্র ভবন নয়, পুড়ে ছাই হয়েছে বহু অমূল্য পুঁথিপত্র ও বই। এর পরও সঠিক সংরক্ষণের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু বইপত্র। সব থেকে বড় প্রশ্ন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্যসভা গড়ে উঠেছিল এবং চলা শুরু করেছিল, সে পথ কতটা পেরনো গিয়েছে।

রাজ ঐতিহ্যের কোচবিহার শিক্ষাদীক্ষায়, চিন্তা- চেতনায় এক আলোকিত অধ্যায় ছিল মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের সময়কালে। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা সংকলন, প্রাচীন গ্রন্থাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ; বিভিন্ন ভাষা থেকে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ প্রকাশ; কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস থেকে শুরু করে সাহিত্যের আলোচনা ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ; প্রাচীন মুদ্রা, লিপি ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগ্রহ, প্রাচীন পুঁথির অনুসন্ধান, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ; গ্রাম্য সাহিত্য, ছড়া, প্রবাদ, ব্রতকথা, উপকথা, গীত-কবিতা ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রকাশ; কোচবিহারের ভাষা প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ ও প্রকাশ; কোচবিহারের গৃহসজ্জা, উদ্ভিদ, জীবাদি সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দের সংগ্রহ ও প্রকাশ; ইতিহাস রচনা, প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ, তীর্থস্থান, মন্দির, দুর্গ, দেবমূর্তি, খোদিত লিপি, তাম্র শাসন মুদ্রা প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহ ও প্রকাশ— আজ থেকে শতবর্ষ আগে কোচবিহার রাজ্যে বসে সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক এই ভাবনা যে অভাবনীয় তা মানতেই হয়। কিন্তু তার কতটুকু বস্তুতপক্ষে কার্যকরী করা গিয়েছে? এই প্রশ্ন শতবর্ষ পূরণের প্রদীপের আলোতেই ফুটে উঠছে।

সেই সময়কালে বঙ্গভাষায় 'কোচবিহার সাহিত্য পত্রিকা' নামে একটি সাময়িকী প্রকাশিত হত। এ ছাড়াও ১৯২৩ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত নিত্যেন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী নিরুপমাদেবীর সম্পাদনায় 'পরিচারিকা' (নবপর্যায়) প্রকাশিত হত, যার মূল্য ছিল দু'টাকা বারো আনা। রাজনগর-এর স্রষ্টা অমিয়ভূষণ মজুমদার এখানে পূর্ণিমা সম্মেলনের প্রচলন করেছিলেন। তার আগেও সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলন হয়েছে যাঁদের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে, তাঁদের মধ্যে অন্যতম স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রমথনাথ বিশী, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর, শান্তিদেব ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ। সাহিত্যসভার অতীতের কর্মসূচি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য হল গবেষণাধর্মী কাজ এবং সমকালীন ইতিহাসকে তুলে ধরা। একই সঙ্গে ভাষা-শিক্ষা-সংস্কৃতিকে লালনপালন করে তাকে পুষ্ট করা। কিন্তু সেই কাজের অগ্রগতি নিয়েও থেকে যাচ্ছে বড় প্রশ্নচিহ্ন।

কোচবিহার সাহিত্যসভা শুধুমাত্র একটি গ্রন্থাগার নয়। প্রাচীন পুঁথিসহ অমূল্য সম্পদের ভাণ্ডার সাহিত্যসভা ছিল একটি গবেষণার। সর্বসাধারণের জন্য ব্যবহৃত কোচবিহারের প্রথম গ্রন্থাগার সাহিত্যসভা পরিচালিত হয় সম্পূর্ণই বেসরকারিভাবে। যদিও পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকেছে, আর ভাষা বা সাহিত্য বিষয়ক গবেষণার প্রসঙ্গ না তোলাই ভাল। আশার কথা, পাঁচ টাকা মাসিক চাঁদার বিনিময়ে কিছু মানুষ এখনও এখানে এসে বই পড়েন। সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য জানালেন, অতীত উজ্জ্বল অধ্যায়কে আমরা ফিরিয়ে আনতে সংকল্পবদ্ধ। সেই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সরকারি সাহায্যের জন্যও বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবেদন করা হয়েছে।

শতবর্ষের গৌরবে উজ্জ্বল বঙ্গ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষাচর্চার এই পীঠস্থানকে বাঁচিয়ে রাখা এ প্রজন্মের দায়। আর এ জেলার মাননীয় জনপ্রতিনিধি, সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা-সংগঠন, বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিকর্মী থেকে শুরু করে ইতিহাসবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, তাঁদের কি কোনও ভূমিকা থাকে না? তাহলে রাজ ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এমন একটি পীঠস্থান নিদারুণ আর্থিক সংকটে নিষ্প্রভ হল কীভাবে? প্রতিষ্ঠানের পুরনো পুঁথি, দলিল-দস্তাবেজসহ মূল্যবান গ্রন্থভাণ্ডার অবহেলা আর অযত্নে নষ্ট হওয়াটা তো ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি চরম ঔদাসীন্যকেই প্রকট করে। আর একটি জাতির ক্ষয় তখনই ত্বরান্বিত হয়, যখন সে তার ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

পিনাকী মুখোপাধ্যায়

চিরনবীন কোচবিহার থিয়েটার ইউনিট

গত শতকের সাতের দশকে কয়েকজন নাট্যোৎসাহী যুবকের সক্রিয়তায় কোচবিহার রানিবাগান জনপদ নাট্যরসিক হয়ে উঠেছিল। সেই পথ ধরেই ১৯৭৪ সালে এসে পড়ে থিয়েটার ইউনিট। ‘বিদিশ’, ‘বিপ্লবের গান’, ‘সাজানো বাগান’-এর মতো একের পর এক মঞ্চসফল প্রযোজনার মধ্যে দিয়ে সারা উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল থিয়েটার ইউনিটের নাটকের কথা। কমলেন্দু চৌধুরী, নীহারেন্দু রায় (পিকু)-এর পরিচালনায় থিয়েটার ইউনিটের ওইসব নাটক সমগ্র ডুয়ার্স জুড়ে তৈরি করেছিল অসংখ্য দর্শক। রানিবাগান, গোলবাগান, পাটাকুড়া অঞ্চলের অধিবাসীরা ওই সময়ে থিয়েটার ইউনিটকে তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান বলেই মনে করত। থিয়েটার ইউনিটের প্রযোজনাগুলি তখন নিয়মিত মঞ্চস্থ হত ল্যান্সডাউন হল ও উত্তরবঙ্গ পরিবহন মঞ্চে। ইতিমধ্যে সরকারি নিবন্ধীকরণের জন্য সংস্থার নামকরণ হয় কোচবিহার থিয়েটার ইউনিট। কিন্তু ওই সময় থেকেই থিয়েটার ইউনিটের গতিবিধিতে খানিকটা হলেও ছেদ পড়ে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভাব থেকে শুরু করে বহুবিধ কারণেই থিয়েটার ইউনিটের ধারাবাহিক নাট্য পরিক্রমা সাময়িকভাবে হলেও ঝিমিয়ে পড়ে।

আবার বছর কুড়ি পর কোচবিহার থিয়েটার ইউনিট পথ চলা শুরু করে প্রত্যয়ী পদক্ষেপে। ইতিমধ্যে থিয়েটার দুনিয়ার পাশাপাশি বাংলা রঙ্গমঞ্চেও ঘটে গিয়েছে অনেক পরিবর্তন। মঞ্চ-ভাবনা থেকে শুরু করে সৃজনের প্রতিটি অনুষঙ্গেই ঘটেছে নানা পরিবর্তন। ডুয়ার্সের নাট্যজগতে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে নতুন ধারার নাটক অণুনাটক।

সাম্প্রতিককালে কোচবিহার থিয়েটার ইউনিটের প্রযোজনাগুলির বিশেষত্ব হল সম্পূর্ণ নতুন নাটক, যা তখনও প্রকাশিত হয়নি। এগুলির অধিকাংশ রচনা ও নির্দেশক পূর্বাচল দাশগুপ্ত। তাঁর ‘অন্ধকারের উৎস হতে’, ‘কুহুযামিনী’, রবীন্দ্রগল্প অবলম্বনে ‘অপবাদ’ দর্শকমনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। থিয়েটার ইউনিটের নতুনভাবে পথ চলার আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল অণুনাটক ও মুক্তাঙ্গন নাটক। পূর্বাচল দাশগুপ্তর রচনা ও পরিচালনায় ‘অপত্য’, ‘সংরোধ’, ‘অন্ধি-সন্ধি’, ‘বসন্ত এসে গেছে’, ‘গৃধ্নু’, ‘সাজাহানের পুনর্জন্ম’ অণুনাটকগুলি, যেগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে অভিনীত হচ্ছে। এ ছাড়াও তাদের মুক্তাঙ্গন প্রযোজনা ‘কীটের খেলায় মনসামঙ্গল’, ‘হোক কলরব’ প্রশংসিত হয়েছে। থিয়েটার ইউনিটের ‘কীটের খেলায় মনসামঙ্গল’ নাটকটি এবার ডাক পেয়েছে শান্তিপুর রঙ্গপীঠ জাতীয় নাট্যমেলায়। এর সঙ্গে তাদের পূর্ণাঙ্গ প্রযোজনা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘পরপারে’ মঞ্চস্থ হবে রঙ্গপীঠ জাতীয় নাট্যমেলায় ও কলকাতার তপন থিয়েটারে গঙ্গা যমুনা নাট্যমেলায়।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করে যাচ্ছে কোচবিহার থিয়েটার ইউনিট। সারা বছর ধরে প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন শিশু-কিশোর নাট্য প্রশিক্ষণ। কোনও সরকারি আর্থিক সাহায্য ছাড়াই থিয়েটার ইউনিট একচল্লিশ বছর পেরিয়েছে। কিশোর-কিশোরীদের অভিভাবক ও সদস্যদের আর্থিক সহায়তায় থেমে যায়নি তাদের নাট্য অন্বেষণ, পরীক্ষানিরীক্ষা, গবেষণা এবং ব্যতিক্রমী প্রযোজনা।

নিজস্ব প্রতিনিধি

ফুটবল মাঠ থেকে নাট্যমঞ্চে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ

কাকভোরে ফালাকাটা টাউন ক্লাবের মাঠে ফুটবল নিয়ে অনুশীলন করছিল এক যুবক। সে বহুদিন আগের কথা। তাকে দেখে এগিয়ে আসেন শেউলমারি আশ্রমের সারদানন্দ, যাঁকে অনেকেই তখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বলে ভুল করত। সারদানন্দ সে দিন উঠতি ফুটবলারটিকে প্রশ্ন করেছিলেন, একা কেন? সে জানিয়েছিল, এসে যাবে সবাই। আরও কিছু জানতে চেয়েছিলেন সারদানন্দ ওই ফুটবলারের কাছে। কিন্তু সে দিন আর কোনও উত্তর না দিয়ে অনুশীলনেই ব্যস্ত থাকে সে। টাউন ক্লাবের কর্মকর্তাদের নানা কথায় সেই প্রসঙ্গ উঠে আসে প্রায়শই। পরবর্তীকালে ফুটবল পায়ে ডুয়ার্সখ্যাত হয়েছিলেন ওই তরুণ। স্কুলজীবন থেকে প্রথম শ্রেণির বিভিন্ন ফুটবল টুর্নামেন্টে তাঁর স্বাক্ষর যতখানি উজ্জ্বল ছিল, ডুয়ার্সের অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্ব হিসেবেও কুড়িয়েছিলেন সুনাম।

উত্তরবঙ্গের নাটকের কথায় এবং ফুটবলের কথাতেও অবশ্যই উঠে আসে নীতীশ দাশ নামটি। বিশেষ করে ডুয়ার্সের নাট্য অভিনেতা হিসেবে তো অবশ্যই। মাত্র ৮ বছর বয়সে ‘টিপু সুলতান’ নাটকে অভিনয় দিয়ে হাতেখড়ি। নিজের স্কুলেই তাঁর চেষ্টায় প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয় ‘সিরাজের স্বপ্ন’। নতুনভাবে অনুপ্রাণিত হয় ফালাকাটার মানুষ। শিক্ষকরাও এগিয়ে আসেন স্কুলের পড়াশোনার ফাঁকে সংস্কৃতির চর্চায়। নীতীশ ছিলেন ফালাকাটা হাই স্কুলের প্রথম স্কুল ফাইনালে পাশ করা একমাত্র ছাত্র। সেখানকার ড্রামাটিক হলটিও ছিল সময়োপযোগী নাট্যমঞ্চ। ওই মঞ্চে তখনকার

ডুয়ার্সের মুখ

কর্মকর্তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বেশ কিছু নাটকে অংশ নেন নীতীশ। বেশির ভাগই ছিল পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক। মঞ্চে যেমন অবাধ বিচরণ ছিল তাঁর, ফুটবল মাঠেও ছিল সাবলীল পদচারণা। সেই সময় ডুয়ার্সের বহু চা-বাগানে নিয়মিত নাটক হত বাগানের নাট্যমঞ্চে। নীতীশের পরোক্ষ যোগাযোগ ঘটত সেইসব নাট্যমঞ্চে। অন্য দিকে ওইসব চা-বাগানেরও ছিল নিজস্ব ফুটবল মাঠ। ডুয়ার্সের এমন কোনও ফুটবল মাঠ নেই, যেখানে নীতীশ খেলেননি। নাট্যপ্রেমী এবং ফুটবলপ্রেমী অগণিত মানুষের সঙ্গে তাঁর সখ্য এখান থেকেই। পুববাংলার নদীমাতৃক শ্যামলিমা ছেড়ে দেশভাগের শিকার হয়েছিলেন নীতীশ। পরবর্তীকালে পাহাড়-জঙ্গল-নদী-ঝোরাময় ডুয়ার্স হয় তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। নায়কের ভূমিকা ও চরিত্রে অভিনয়ে উত্তরবাংলার প্রথম শ্রেণির অভিনেতা হয়ে ওঠা নীতীশ চলচ্চিত্রজগতেও স্বীকৃতি লাভ করেন নীতীশ। একজন দক্ষ নাট্য পরিচালক তিনি এখনও। তাঁর সাংগঠনিক শক্তি বহু মানুষকে একত্রিত করেছে। উত্তরসূরিদের কাছে তিনি আদর্শ ব্যক্তিত্ব। শুধু অভিনয় ও ক্রীড়াজগৎই নয়, নীতীশ দাশ সুলেখকও। বর্তমানে ডুয়ার্সকে ভালবেসে গবেষণায় মেতে রয়েছেন। তাঁর লেখা ‘অতীতের আলোকে বক্সা’ বন্দি শিবির বিষয়ে আকরগ্রন্থ রূপে স্বীকৃত। ডুয়ার্সের পরিবেশ নিয়ে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছেন নীতীশ। পরিবেশবান্ধব হিসেবে আজীবনের সঙ্গী বাইসাইকেলেই যাতায়াত করেন সর্বত্র। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচ গুণীজনকে সংবর্ধনা জানিয়েছে উত্তরবঙ্গের বহুল প্রচলিত একটি দৈনিক। সেই তালিকায় রয়েছেন নীতীশ দাশও।

পরিতোষ সাহা

ডুয়ার্স থেকে দিল্লি

দেবপ্রসাদ রায়

একজন রাজনৈতিক নেতার জীবন ধারাভাষ্যে ফুটে ওঠে ডুয়ার্সের মানুষ ও রাজনৈতিক বিবর্তনের চালচিত্র। শৈশব আলিপুরদুয়ার জংশনের রেল কলোনিতে কাটাবার অভিজ্ঞতা পুরোপুরি ফিকে হয়ে যায়নি। মজদুর ইউনিয়নের চোঙায় শ্লোগান আউরে সম্ভবত হাতে খড়ি হয়েছিল। লেখাপড়ার জন্য ভর্তি করা হল কোচবিহারের নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলে। পিতৃদেবের মতো শিক্ষকদেরও ধারণা হল, ফাইনাল পরীক্ষায় তার উতরোবার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

২

কোচবিহারের ছাত্রজীবনে নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলের নলিনী স্যারের চুড়ি পরার বাসনা বোধহয় আমার মনে পাশ করার বাসনা জাগিয়ে তুলেছিল। আমি তখন কল্পনায় দেখতে ভালবাসতাম যে, নলিনী স্যার চুড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু কল্পনার ছবি বাস্তবে দেখতে গেলে পাশ করা দরকার। সেটা আমার কাছে তখন অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু অসম্ভবকে যিনি সম্ভব করালেন, তিনিও একজন মাস্টারমশাই। তাঁর নাম দীপেন দে। তিনি আমাদের পড়াতেন সিভিক্স আর ইকনমিক্স। ওই দুটো তখন জয়েন্ট সাবজেক্ট হিসেবে পড়ানো হত।

এসব ক্লাস নাইনের কথা। সেবার যাণ্মাসিক পরীক্ষার খাতা দেখানো হবে ক্লাসে। দীপেন স্যার খাতার বান্ডিল নিয়ে ক্লাসে এসে বললেন, ‘নাম্বারের দিক দিয়ে বিচার করলে দেবপ্রসাদ কমই পেয়েছে। পিছনের দিকেই ওর স্থান। কিন্তু সবচাইতে ভালো ও-ই লিখেছে।’

এই কথায় ক্লাসে হাসির হুল্লোড় বয়ে গেল একেবারে। যারা ভাল ছাত্র, মানে প্রথম দিকের বেঞ্চগুলোতে বসত, তারা কেউ কেউ সহাস্যে জানতে চাইল, ‘ভালই যদি লিখেছে, তবে নাম্বার কেন কম পেল স্যার?’

এর জবাবে দীপেন স্যার যা বলেছিলেন, আজও মনে হয় যে অতটা না বললেও পারতেন। কিন্তু তাঁর জবাবটা আমাকে সে দিন যে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল, তা আমার সম্পদ হয়ে আছে। জানি না তাঁর বলার উদ্দেশ্য কী ছিল। কিন্তু তিনি জবাবে বলেছিলেন, ‘হতে পারে যে ও যেটা লেখে, তার সবটা আমরা বুঝতে পারি না। না বুঝেই কম নম্বর দিই হয়ত!’

তারপর অর্থনীতিবিদ কেইন্স সাহেবের

জেনারেল কারিয়াপ্পা ছিলেন ভারতীয় সেনবাহিনীর প্রথম কমান্ডার ইন চিফ

উদাহরণ দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে, সেই বরেণ্য অর্থনীতিবিদ এম.এ. পরীক্ষায় তিনবার ফেল করেছিলেন।

আজ আমি বিলক্ষণ বুঝি যে, নম্বর ইত্যাদি নিয়ে মেধাকে বিচার করা যায় না। মনে হয় যে, দীপেন স্যার বোধহয় সেটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। যা-ই হোক, আমার মানসনেত্রে নলিনী স্যারের চুড়ি পরে ঘুরে বেড়ানোর দৃশ্যটা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

এরই মধ্যে চিন-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্কুলের পাশে রাসমেলার বিরাট মাঠ। যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য চাঁদা তোলার একটা ব্যবস্থা ছিল। মানুষ যাতে সেই তহবিলে দান করেন, তার জন্য বিখ্যাত ব্যক্তিরা ঘুরে ঘুরে সভা করতেন। যুদ্ধের খরচ তোলার জন্য দান করার আহ্বান রাখতেন। এটা মনে হয় ১৯৬২ সালের কথা— প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য সভা করতে একবার সেনাপ্রধান কারিয়াপ্পা এলেন। আরেকবার এলেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি ডি সঞ্জীব আইয়া। এই তহবিল গড়ার ব্যাপারটা আমাকে খুব উৎসাহিত করেছিল। আমি দায়িত্ব নিয়ে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করলাম। প্রতিরক্ষা তহবিলে পাঠিয়েছিলাম সাতশো টাকা।

সেকালের হিসেবে সাতশো টাকা খারাপ ছিল না। কিন্তু এই টাকার অধিকাংশ পাওয়া গিয়েছিল খালাসি পট্টি থেকে। এর পিছনে যার অবদান ছিল সর্বাধিক, সে ছিল সেকালের কোচবিহার শহরের একজন কুখ্যাত ব্যক্তি। নিউ সিনেমা হলে টিকিট ব্ল্যাক ছিল ওর নেশা। ওর নাম ছিল শিকারি।

আমি জানি না পরবর্তীকালে শিকারির কী পরিণতি হয়েছিল! কিন্তু কুখ্যাত হিসেবে পরিচিত তথাকথিত সমাজবিরোধী শিকারি কেন প্রতিরক্ষা তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তা আমার অজানা। মানুষ বড় আশ্চর্য সৃষ্টি!

ওই যুদ্ধের সময় থেকেই আমার মনে নিজের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তটা পাকাপোক্তভাবে বসে যেতে শুরু করে। তখন আমার মনে হয়েছিল যে, দেশ আক্রমণকারী চিনকে যারা পরোক্ষ এবং প্রচ্ছন্নভাবে সমর্থন জোগাচ্ছে, সেই রাজনৈতিক দলের বিরোধিতা করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত থেকেই আমার পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্ধারিত হয়েছে।

যা-ই হোক! ইতিমধ্যে নলিনীবাবুর চুড়ি পরার সম্ভাবনা কিছুটা উজ্জ্বল হয়েছে। দীপেন স্যারের অনুপ্রেরণায় কিঞ্চিৎ ফল দিতে শুরু করেছে। কিন্তু এই সন্ধিক্ষণে বাবার আবার বদলির নির্দেশ এল। এবার জলপাইগুড়ি। ফলে কোচবিহারের পাট চুকিয়ে আমাদের চলে আসতে হল জলপাইগুড়ি।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। স্কুলজীবনে আমার একটি দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ছিল। তার নাম সংস্কৃত। এই বিষয়টা আমার কাছে ছিল আতঙ্কের অপর নাম। সংস্কৃত পরীক্ষার আগের দিন বন্ধুরা যখন তেড়ে পড়ত, আমি তখন কাঁদতাম। আমি যে ক্লাস টেন পর্যন্ত সংস্কৃত পড়েছি, তার কোনও চিহ্ন আমার মধ্যে নেই। বিষয় হিসেবে সংস্কৃত কোনও দিনও যদি না থাকত, তবে যা হত, টেন পর্যন্ত থেকে সেই একই হয়েছে।

বলতে পারেন যে, ইলেক্টিভ সাবজেক্ট হিসেবে কেন নিতাম সংস্কৃত? আসলে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এর পিছনে কারণ ছিল একটু অন্যরকম। আমি ছিলাম ১৯৬৫ সালের হায়ার সেকেন্ডারির ব্যাচ। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৬ থেকে সংস্কৃত উচ্চমাধ্যমিকেও আবশ্যিক বিষয় হিসেবে থাকবে। নৃপেন্দ্রনারায়ণের মাস্টারমশাইরা ব্যাপারটা একটু আগে থেকেই চিন্তা করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, আমাদের ব্যাচের কেউ যদি একবার ফেল করে যায়, তবে তাকে সংস্কৃত আবশ্যিক বিষয় হিসেবে নিতেই হবে। তখন পাশের হার ছিল কম। সে কারণে তাঁরা এক বছর আগে থেকেই সংস্কৃত পড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। মনে হয় আমার কথা ভেবেই এটা করেছিলেন তাঁরা। আমার ফেল করার সম্ভাবনা প্রবল থাকায় আর ঝুঁকি নেননি হয়ত।

এরই মধ্যে বাবা বদলি হন জলপাইগুড়িতে। সেটা ১৯৬৪ সাল। আগের বছর দাদা গ্র্যাজুয়েট হয়ে গিয়েছে। মেজদা হায়ার সেকেন্ডারি। আর ভাইবোন সব ছোট ছোট। স্কুলে পড়ছে। মোটামুটিভাবে আমিই ছিলাম খুব 'ক্রুশিয়াল পজিশন'-এ।

জলপাইগুড়িতে তো এলাম। এবার ভরতি হব কোথায়? লাইফ ইনশিয়োরেন্সে বাবার কলিগ ছিলেন মৃণালদা। আমরা বলতাম মৃণালকাকু। তিনি একদিন বাবাকে বললেন যে, তিনি যেন আমাকে নিয়ে সোনাউল্লা স্কুলে চলে আসেন। সেইমতো বাবা আমাকে নিয়ে ওই স্কুলে গেলেন। সঙ্গে মৃণালকাকু। বীরেন দাশ তখন সোনাউল্লার হেডমাস্টার। তিনি আমার মার্কশিট দেখে বললেন, 'ভরতি হওয়া সম্ভব নয়।' কারণ জানতে চাইলে তিনি জানালেন, সোনাউল্লায় হায়ার সেকেন্ডারিতে সংস্কৃত পড়ানোর ব্যবস্থা নেই এবং একজন ছাত্রের জন্য সংস্কৃত পড়ানোর আয়োজনও সম্ভব নয়।

এর পর বীরেন দাশ একটা আপাত অবাস্তব প্রস্তাব দিলেন, যা আমার জীবনে অনেকটা অবদান রেখে গেল। তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি তিন বছরের ভূগোল এক বছরে পড়তে পারবে?' আমি তখন সংস্কৃতের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য ছটফট করছি। প্রস্তাবটা তাই লুফে নিয়ে বললাম, 'পারব স্যার। আমাকে একটা সুযোগ দিন।'

তিনি সুযোগ দিলেন। আমার কম্বিনেশন ইলেভেনে এসে বদলে গেল। ছিল হিস্ট্রি, ইকনমিক্স, সংস্কৃত। শেষেরটা বদলে হল জিয়োগ্রাফি। কিন্তু সোনাউল্লা স্কুলে ইলেভেনে ভরতি হওয়ার পর বুঝলাম, আমাকে একজন ভাল ছাত্র হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে। সোনাউল্লার ওই ব্যাচে মেধাবী ছাত্র বলতে তেমন কেউ ছিল না। ইকনমিক্সের সুবোধ মিত্র, ভূগোলের সিতাংশু সাধ্য, হিস্ট্রির রবীন মিশ্র সমেত টিচাররা সবাই আমাকে বিশেষ যত্ন নিতে থাকায় আমি ভাল রেজাল্ট করার চাপে পড়লাম।

সোনাউল্লায় আমার সহপাঠীদের মধ্যে বীরেশ শিকদার প্রাইমারির শিক্ষক হয়েছিল। সঞ্জীব বলে একজনকে মনে পড়ছে— সে চাকরি নিয়েছিল স্টেট ট্রান্সপোর্টে কন্ডাক্টর হিসেবে। বিমান দে খেলত ফুটবল। বরুণ গুহ রায় বলে আরেকজনের নামও মনে আছে।

সব মিলিয়ে সোনাউল্লা স্কুলে এসে পরিস্থিতির খাতিরে আমার ছাত্রজীবনে একটা পরিবর্তন এসেছিল। এর পর স্কুল ছেড়ে যাব এ.সি. কলেজে। রাজনীতিতে আরও জড়িয়ে পড়ব।

ফেলে আসা জীবনের অনেক কথাই ভেসে আসছে মনের মধ্যে।

(ক্রমশ)

এখন ডুয়ার্স প্রাপ্তিস্থান

শিলিগুড়ি
বিশ্বাস বুক এজেন্সি- ০৩৫৩-২৫৩১০১৭
শিবমন্দির
অনুপ দাস- ৯৮৩২০২৯৫১৪
জলপাইগুড়ি
ভবতোষ ভৌমিক- ৯৭৩৩২৪৬৯১৩
হলদিবাড়ি
অমল দাস- ৯৪৩৪৮০৬৩৮৩
মালবাজার
মিনি বুক স্টোর- ০৩৫৬-২২৫৫০১৫
মালবাজার
ভবতোষ রায়চৌধুরী- ৯৮০০৩০৬৫২৭
চালসা
দিলীপ সরকার- ৯৭৭৫৪১৫১৪৪
বিন্নাগুড়ি
রমেশ শর্মা, সিটি বুক স্টল- ৯৪৩৪৮০৯৫৯০
বীরপাড়া
বরুন ঘোষ, পোকিসা- ৯৫৯৩৩৫৪১৫২
লাটাগুড়ি
বিশ্বজিৎ রায়- ৯৯৩২৫৪৬৩২০
ময়নাগুড়ি
দেবাশিষ বসুভাট- ৯৯৩৩১৯০৮৫৮
ধূপগুড়ি
অমিত কুমার দে- ৯৬৪৭৭৮০৭৯২
ফালাকাটা
অমল চন্দ্র পাল- ৯৪৩৪৪১২৬৪৯
আলিপুরদুয়ার
দীপক হোড়- ৭৬৭৯৮৯৫৩০৭
কোচবিহার
জয়ন্ত দাস- ৯৪৩৪২১৭০৮৪
আরতি ঘোষ, কাছাড়ি মোড়
তুফানগঞ্জ
দীপেন্দ্র সাহা- ৮৯৭২০২০৬০০
মাথাভাঙা
বরুন সাহা- ৯৪৩৪৩৩৭৭৬৮
দিনহাটা
আবেদ আলি- ৯৮৩২৩৪৭৪৫১
মালদা
অমিত কুমার দাস, পুষ্প নিউজ এজেন্সি- ৯৯৩২৯৬৭৯৯১
রায়গঞ্জ
সুরঞ্জন সরকার- ৯৪৩৪৪২৩৫২২

ইচ্ছুক এজেন্টরা যোগাযোগ করুন
৯৮৩০৪১০৮০৮

কলকাতায় এখন ডুয়ার্স পরিবেশক
০৩৩-২২৫২৭৮১৬

ধারাবাহিক কাহিনি

তরাই উৎরাই

১৭

বঙ্কিম রায় ওরফে হিদারুর সৌভাগ্য যে জীবনে তিন-তিনটি দশক পার করেও পরিবারের ঘনিষ্ঠ কোনও সদস্যের মৃত্যু দেখেনি। দাদাদের সন্তানরা অবশ্য মরেছিল তিন-চারজন। কিন্তু জীবিত সন্তানদের ভিড়ে, তাদের উচ্ছলতায় সেসব মরে যাওয়া হিদারুকে তেমন বিচলিত করেনি। তিরিশ বছরের জীবনে আরও আরও মরে যাওয়া দেখেছে হিদারু। কিন্তু বাপ-মা-ভাই-দাদাদের শিয়রে এতদিন অনুপস্থিতই ছিলেন যমরাজ। মনসা মেলার তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় তাঁকে পায়চারি করতে দেখা গেল হিদারুর বাপের আশপাশে। টাউনে বিলিতি ওষুধ দেওয়া ডাক্তার থাকলেও দেশজ ওঝা-কবিরাজের বাইরে চিকিৎসার প্রথা ছিল না পরিবারে। বাপের গা গরম যাচ্ছিল ক'দিন ধরেই। ম্যালেরিয়া না। এ জ্বর কেমন জানি ঘুসঘুসে, আর কিছু খেলেই বমি হয়। হিদারুদের বাড়ি থেকে একশো হাতের মধ্যে অন্তু ডাক্তারের বাড়ি কাম চেম্বার। দু'টাকা ভিজিট দেওয়া নিয়েও হিদারুর পরিবারের কোনও সমস্যা ছিল না। তবুও তাঁকে ডাকা হয়নি। শেষে দুপুর নাগাদ কবিরাজ এবং ওঝা হিদু রায় যখন জানালেন যে খারাপ ধরনের মাশানের দৃষ্টি লেগেছে, তখন পরিবারে প্রথম কান্নার রোল ওঠার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। হিদারু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পথের কোনায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল কিছুক্ষণ। তোসাদ্দুক আহমেদ তখন দুটো বাড়ি পরে নয়াবস্তির মসজিদ কীভাবে পাকা করা যায়, সে বিষয়ে মিটিং করছিলেন, আর বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল তাঁর ঘোড়ার গাড়ির সহিস সুলেমান।

হিদারুর বাড়িতে কান্নার রোল উঠতেই সুলেমান কিছু একটা আন্দাজ করে হিদারুর কাছে গিয়ে জানতে চায় কী হয়েছে। তারপর একটু ভর্ৎসনার সুরে বলে, 'আপনি ইশকুলে পরসেন, ল্যাখাপড়া জানেন, আর ডাক্তার ডাকেন নাই?'

এর পর কিন্তু ডাক্তারকে বাড়িতে ডেকে আনা হলেও কিছু করার ছিল না। কারণ কালাজ্বরের চিকিৎসা অজানা ছিল ডাক্তারবাবুর। মাঝরাতের একটু পরেই বাপ শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। এর পর প্রায় দিন পনেরো হিদারুর কেটেছে ঝড়ের মতো। এই প্রথম সে বুঝতে পারল, দেশি মানুষের কাছে তাদের পরিবারের খাতির কতটা জমেছিল। জানতে পারল কত কত জায়গায় ভূসম্পত্তি কিনে রেখেছিল তার বাপ। টাউনের বাবুরাও এসেছিল বেশ কয়েকজন। তাঁরা জানিয়ে গেলেন, সে বাপ চা-বাগানের শেয়ারও কিনেছিল বেশ কিছু। পাশাপাশি এটাও হিদারু ভালমতো উপলব্ধি করল যে, বাপের অবর্তমানে তাদের পরিবারের এতদিনের অখণ্ডতাও ক্রমশ মিলিয়ে যাবে। বাইরের লোকজনের যাতায়াত কমে আসার পর দাদাদের দুই দলে ভাগ হয়ে একদিন প্রচণ্ড ঝগড়া তাকে স্তম্ভিত করে দিল এর পর। বাড়ির শিশুরাও স্তম্ভিত হয়েছিল ঠিক তারই মতো।

মাসখানেক পর শরতের উজ্জ্বল অথচ প্রশান্ত সকালে ঘুম থেকে উঠে হিদারু অনুভব করল যে, বাপ চলে যাওয়ার পর এই প্রথম সে গত রাতে গভীর ঘুমিয়েছিল। সূর্যের নরম আলোয় দাঁতন করতে করতে বুঝতে পারল, মন আবার আগের মতো শান্ত হয়ে এসেছে। কদমতলার কাছে নিজের ভাগের জমিতে একটা বাড়ি বানিয়ে চলে যাওয়ার মতো অবিশ্বাস্য ভাবনা খুব সহজেই ভাবতে পারছে সে। কাঠা দশেকের জমি। দাদারা ঘর তুলে দেবে। ফসলের ভাগ দেবে। হিদারুর চলে যাবে। দাদারা যে কথার খেলাপ করবে না, সেটা বিলক্ষণ বোঝে হিদারুর। ওদের দুটো দলই তাকে নিজেদের দিকে টানতে চেয়েছিল। কিন্তু হিদারু কোনও পক্ষেই থাকেনি। কী করে থাকবে? দুই পক্ষেই যে তার দাদা!

দাঁত মেজে তৃপ্তি করে দই দিয়ে মাখা চিঁড়ে খেল হিদারু। খদ্দরের ফতুয়াটা গায়ে চরিয়ে তারপর বার হল পথে। সেই মনসা মেলার পর থেকে রাজনীতির খবর বিশেষ জানে না সে। টাউনে অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে মাতামাতির খবর পেলেও দেশে কী হচ্ছে তা জানা নেই। তুলো না থাকায় তার বউ অনেকদিন চরকা কাটতে পারেনি। দিনবাজারের দিকে গিয়ে তুলো কিনবে বলে হিদারু আগে সেদিকে যাওয়ার কথাই ভাবল। বরকত আলির বাড়ির পেছন দিয়ে, সেনাদের পুকুরের পাশ দিয়ে শর্টকাট মেরে হিদারু একটা গলির বাঁকে আসতেই শুনল খুদিদার গলা। তিনি কুলির মাথায় বাজার চাপিয়ে ফিরছিলেন। উপেনের কথা ভেবে হিদারু সতর্ক হল।

—কাজকর্ম সব মিটে গিয়েছে?

হিদারুর নেড়া মাথায় গজানো গুঁড়ি গুঁড়ি

হিদারুও দেখল। ছয় সিলিন্ডারের শক্তিশালী চকচকে গাড়িটি বেরিয়ে গেল প্রায় তার এক হাতের মধ্য দিয়ে। হিদারু দেখল, জগদিন্দ্রদেব রায়কতের চোখ দুটো যেন তার শরীরের দিকে একবার পলকের জন্য স্থির হয়ে আবার সরে গেল আকাশের দিকে। জগদিন্দ্রদেব কি তাকে দেখলেন? কিন্তু কী করে দেখবেন? তাঁর দৃষ্টিশক্তি বলতে তো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই!

চুল লক্ষ করে বললেন তিনি। হিদারু মাথা কাত করে বলল, 'হ্যাঁ।'

—কোথায় যাচ্ছিস এখন?

—টাউনে বের হলাম দাদা। খবর-সবর তো কিছুই জানি না।

—উপেনেরও খবর জানিস না?

—চিঠি দেয় নাই উপেন?

—তা দিয়েছে। সে চিঠি অনুযায়ী বাবু নাকি ব্যবসার কাজ শিখছে এক হিন্দুস্থানির কাছ থেকে।

—কোথায়?

—সেটাই তো রহস্য হে! খুদিদা একটু হাসলেন। হিদারু বুঝল যে হাসিটার অর্থ ঠিক হাসি নয়। 'কোথায় আছে, সেটাই লেখে না। আজকাল একদিন আয় তো আমার বাসায়। সন্ধের আগে আসিস।'

নির্দেশের সুরে কথা শেষ করে খুদিদা আবার হাঁটতে শুরু করেছেন। হিদারুর চিন্তাকে ততক্ষণে দখল করে নিয়েছে উপেনের প্রসঙ্গ। খুদিদার ডাক শোনামাত্রই বিস্মরণের অতল থেকে টুপ করে ভেসে উঠেছে উপেন। এ ক'দিন উপেনের কথা মাথাতেই আসেনি তার। কিন্তু এখন সে কোথায়? খুদিদার কথা শুনে যা মনে হল, তাতে উপেন কোথায় থাকে, সেটা ওঁর অজানা। তার মানে উপেন ঠিকমতো এগচ্ছে। এটাই তো প্ল্যান ছিল তার। কিছুদিন পর তার খবর নিয়ে একজন আসবে খুদিদার কাছে টাকা নিয়ে যেতে। সে কি এসেছে? অবশ্য কে আসবে, তা জানা নেই হিদারুর। ফলে সে সিদ্ধান্তে এল যে, আজই সে যাচ্ছে খুদিদার বাড়িতে। কয়লার দোকানের পিছন দিয়ে আরেকটা শর্টকাট মেরে দিনবাজারের রাস্তায় উঠে হিদারুর মনে হল মেলা বসেছে। আসলে বাজার নিত্যদিনের মতোই বসেছিল তখন। কেবল হিদারুর মনে হচ্ছিল মেলা। লোকজন, কলরব, কর্মচাঞ্চল্যের চেনা ছবিগুলো নতুন করে ধরা দিচ্ছিল তার ইন্দ্রিয়ে। তার উদ্ভাসিত মুখে ফুটে উঠছিল এক নবচিহ্ন।

সেটা পরিণত হয়ে ওঠার চিহ্ন।

তখন রাজবাড়ির দিক থেকে একটা মোটরগাড়িকে আসতে দেখা গেল। বাজারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যাবতীয় হইচই কয়েক সেকেন্ডের জন্য মৃদু হয়ে গাড়ির মূল আরোহীকে সম্মান জানাল যেন। গাড়ির হুড পেছন-গুটানো। পিছনের সিটে খদ্দেরের সাদা চাদর গায়ে দেওয়া যে আরোহী বসে ছিলেন, তাঁর চোখ দুটো শান্ত দেখালেও তিনি আসলে বিশেষ কিছু দেখতে পারছিলেন না। শহরের মানুষ এখনও তাঁকে রাজা বলে সম্মান জানালেও তাঁর পরনে খুবই সাধারণ ধুতি আর পায়ে খড়ম। চা-বাগানের শ্রমিকদের সুকঠিন জীবনযন্ত্রণা দেখে তিনি চায়ের শেয়ারের বিপুল লাভ্যাংশ বিলিয়ে দিয়েছেন ক্ষণিকের সিদ্ধান্তে। রাজার এই সন্ন্যাসী রূপ শহরবাসীর কাছে বড়ই শ্রদ্ধেয়। বাজারের কোলাহল স্তিমিত হয়ে সেই শ্রদ্ধাই জানাল আরেকবার।

হিদারুও দেখল। ছয় সিলিন্ডারের শক্তিশালী চকচকে গাড়িটি বেরিয়ে গেল প্রায় তার এক হাতের মধ্য দিয়ে। হিদারু দেখল, জগদিন্দ্রদেব রায়কতের চোখ দুটো যেন তার শরীরের দিকে একবার পলকের জন্য স্থির হয়ে আবার সরে গেল আকাশের দিকে। জগদিন্দ্রদেব কি তাকে দেখলেন? কিন্তু কী করে দেখবেন? তাঁর দৃষ্টিশক্তি বলতে তো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই!

একরাশ ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলে গেল দক্ষিণে। বাজারের জনতা আবার মেতে উঠল স্বাভাবিক কথোপকথনে, বিতণ্ডায়। গাড়ি জগদিন্দ্রদেবের নিজের নয়। বাগচি উকিলের গাড়িতে চেপে হয়ত তিনি কোথাও চলেছেন। হয়ত কংগ্রেসের জরুরি কোনও মিটিং আছে আজ। তিনিই তো প্রেসিডেন্ট এখন জেলার।

হিদারু তুলো কিনবে বলে দিনবাজারের পুল পার হল। মূল বাজারে ঢোকার মুখেই টিন আর বেড়ার তৈরি জামাকাপড়ের দোকানগুলোর পাশে গলিপথ থেকে বেরিয়ে এল একটা ঘোড়ার গাড়ি। গাড়ির আরোহী হিদারুকে লক্ষ করেছে একটু আগেই। এবার সে গাড়িটিকে থামাবার হুকুম দিয়ে প্রায় লাফিয়ে নামল রাস্তায়। তারপর প্রায় দৌড়ে এসে হিদারুর পথ আটকে বলল, 'আমি জানি আপনি উপেনের ভাল বন্ধু। একবার আমার সঙ্গে আসবেন?'

হিদারু তাকাল বক্তার দিকে। তার বয়সিই হবে। পরনে মিহি ধুতি, পাতলা পাঞ্জাবি আর গায়ে চকচকে জুতো। বোঝাই যায় ভাল ঘরের সন্তান। কিন্তু হিদারু তাকে চেনে না।

—আমি জলপাইগুড়ির লোক নই। তবে দিদির বাড়িতে এসেছি। মাঝে মাঝেই আসি। আপনার সঙ্গে কথা আছে। চলুন।

—কোথায়?

—গাড়িতে উঠুন। তারপর বলুন কোথায় একটু ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাবে। পান্ডাপাড়া গ্রামের দিকে যাওয়া যায়?

—সে তো একটু দূরে।

—অসুবিধা নেই। চলুন।

তারপর একটু হেসে বলল, 'আমার পরিচয়টাই দিইনি। আমি উপেনবাবুকে চিনি। জলপাইগুড়ি ছাড়ার দিন আপনিই তো ছিলেন উপেনের সঙ্গে?'

হিদারু অবাক হয়ে বলল, 'আপনি জানেন?'

—গাড়িতে উঠুন। বলছি।

শহরে বড় হলেও হিদারু ঘোড়ার গাড়ি প্রায় চড়েইনি। এখন শহরের মধ্য দিয়ে গাড়ি চেপে চলতে চলতে তার মনে হল, ব্যাপারটা মন্দ নয়। অবশ্য গাড়ি চড়াটা সে পুরো উপভোগ করতে পারছিল না। সহযাত্রীর পরিচয়টা এখনও জানা হয়নি। উপেনের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও কিছুতেই অনুমান করা যাচ্ছে না। অথচ গাড়িতে উঠে বাবু চুপ মেরে গিয়েছেন। অবশেষে মিনিটকয়েক পরে গাড়ি যখন রেল লাইন পেরিয়ে দু'ধারে জলাজমির মধ্য দিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে পান্ডাপাড়া গ্রামের পথ ধরেছে, তখন সে হিদারুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার নাম গগনেন্দ্র মিত্র। উপেনের খবর দেওয়ার আছে আপনাকে। কিন্তু আপনি বাবা মারা যাওয়ার কারণে বাড়ি থেকে বের হচ্ছিলেন না বলে যোগাযোগ হয়নি।'

—আমাকে আপনি চিনলেন কী করে?

—আপনার বাবার কাজের দিন গিয়েছিলাম আপনার বাড়িতে। বলে রহস্যময় হাসি হাসল গগনেন্দ্র। 'চিনতেই গিয়েছিলাম।'

—উপেন এখন কোথায়?

—পান্ডাপাড়া গ্রামের সুবোধ শর্মাকে চেনেন?

—সহিসকে সে বাড়ির রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে চলুন। তারপর বলছি।

বাকি রাস্তা আর কোনও কথা বলল না গগনেন্দ্র। আর তার পাশে বসে ঘোড়ার গাড়ির দুলুনি শরীরে মাখতে মাখতে অপরিসীম কৌতূহলে ফুটতে লাগল হিদারু। বাইরে এক-মাঠ ফসল সোনালি হয়ে মিশে যাচ্ছিল দিগন্তে। তার পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তা বাঁক নিয়েছে। সে বাঁকের অদূরেই দেখা যাচ্ছিল কালী মন্দির। উত্তেজনায় সুবোধ শর্মার বাড়িটা ভুলেই যাচ্ছিল হিদারু। শেষ পর্যন্ত সে চিৎকার করে বলল, 'এই! ডাইনে লাও! ডাইনে ঘুমাও!'

মুসলিম সহিসটি বাঙালি। হিদারুর হিন্দি শুনে সে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'ডান দিকেই তো নিসি কত্তা! ওই বাড়ি আমি সিনি।'

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

অস্ত্রপাচার

সুনীলকুমার দাস

জলপাইগুড়ি জেলার সদর মহকুমায় নাগরাকাটা একটা সাধারণ বাজার। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, চা-বাগান ঘেরা একটা ব্লক। মালবাজার চালসা থেকে সোজা পূর্ব দিকে চলে গিয়েছে এলআরপি রোড। এই রাস্তা দিয়ে যেতেই বাঁ হাতের কাছেই এই বাজারটি। এখান থেকে উত্তর দিকে অনেকগুলো চা-বাগান নিয়ে উঁচু মালভূমি সরু হয়ে ভুটানের গোলাবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূখণ্ডের পূর্বে, পশ্চিমে এবং উত্তরে ভুটান। এই ভূখণ্ডই এ জেলার উচ্চতম অক্ষাংশ ২৭ ডিগ্রি ছুঁয়েছে। মাটিও চা-বাগানের পক্ষে আদর্শ। এই জন্য এখানকার বাগানগুলো বেশ লাভজনক, সমৃদ্ধশালী। 'কুরতি বাগান' নামে একটি মাড়োয়ারিদের বাগান রয়েছে। আমরা দুই বন্ধু মিলে হঠাৎ স্থির করলাম যে ওখানে তো কানু রয়েছে। কানু তার বাংলোতে বেড়াতে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়িও করেছে।

এখন অক্টোবর মাস পড়েছে, নির্মল আকাশ। বেড়াতে যাওয়ার আদর্শ সময় তো এটাই। বাপ্পা আর আমি যাওয়ার দিনক্ষণ স্থির করে ফেললাম। কানুর ফোন নম্বরটা জোগাড় করে ওকেও জানান দিয়ে পিসি মিতাল থেকে থালঝোরাগামী বাসে উঠে বসলাম। সঙ্গে নিলাম ব্যাগ। ব্যাগের গর্ভে রয়েছে কিছু স্ন্যাক্স আর কিছু পানীয়, কাপড়চোপড়, টর্চলাইট, ক্যামেরা আর বাইনোকুলার। কানু গল্প করেছে যে ওখানে হরিণের মাংস, জংলি শুয়োরের মাংস, মাশরুম, জংলি নদীর কাঁকড়া, কুচো চিংড়ি— এসব পাওয়া যায়। সবচাইতে মজাদার যেটা পাব, সেটা হচ্ছে নির্জন নিরিবিলি পরিবেশে শুধু একটা বাংলোতে আমরা তিনজন একত্রে থাকার আনন্দ।

বাসটা নাগরাকাটায় গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেরি করে তারপর আবার রওনা হল। খানিকটা দূর যেতেই বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখি আমরা বেশ অনেকটা উঁচু এক সমভূমির উপর দিয়ে চলেছি। বাসটা থেমে থেমে যাচ্ছে। আমি কানুকে ফোন করে জানিয়ে দিলাম। কানু বলল, 'ঠিক আছে, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোদের বাসরাস্তা থেকে তুলে নিয়ে আসবে।' বাস যথাস্থানে না দাঁড়াতেই কন্ডাক্টর জানাল, 'কুরতি বাগান, চলে আসুন কুরতি।' বাস থামতেই ব্যাগ নিয়ে নেমে পড়লাম। নিমেষে বাসটা চলে গেল। রাস্তার ওপারে একটা হুড-খোলা জিপ দাঁড়ানো, একটা যুবক রাস্তা পেরিয়ে এগিয়ে এসে আমাদের বলল, 'স্যার, আপ লোগ সরকার সাহাব কা আদমি?'

—হাঁ হাঁ।

—আইয়ে স্যার। বলে সে দুটো ব্যাগই দু'হাতে তুলে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে জিপে চাপিয়ে দিল। আমরাও জিপে চাপলাম। জিপটা এবার চলতে শুরু করল। দু'ধারে সবুজ চা-কার্পেট পাতা। আর তারই মাঝে বিটুমিনের রাস্তা চলে গিয়েছে। কত দূর এ রাস্তা গিয়েছে কে জানে। মনে পড়ে গেল— 'এই পথ যদি না শেষ হয়... বলো তো।' রাস্তা দু'বার বাঁক নেওয়ার পর একটা বাংলোর ফটকের সামনে দাঁড়াল। প্রহরী ফটক খুলে দিয়ে আমাদের স্যালুট করল। বুঝলাম, নির্ঘাত কোনও বাহাদুর হবে। আমরা নামতেই আরও জনা দুয়েক বাহাদুর এসে ব্যাগ নামিয়ে ঘরের ভিতরে রেখে দিল। মস্ত বড় সুশোভিত বারান্দা পেরিয়ে এসে ডাইনিং হল, তারই একপাশে একটা ডাবল বেডরুমে বসলাম। আসবাবগুলো দেখে মনে হল, সেই ইংরেজ চা-কররা তৈরি করিয়েছিল। কাচের জানালা দিয়ে দেখলাম পাশেই খাদ, ওপারে পাহাড়, গাছপালায় ঠাসা জঙ্গল। জানালাটা খুলতেই ঝমঝম আওয়াজ ভেসে এল। বুঝলাম পাহাড়ি নদীর শব্দ।

বাপ্পা টয়লেটে গিয়েছে। ও এলে আমিও যাব। ততক্ষণে কানুকে কল করলাম, হ্যাঁ, তুই কোথায় রে? কে যেন আমাদের পণবন্দি করে রাখল, নাকি কোনও অচল মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে কে জানে, হাবার মতো চলে এলাম। কোথায় এলাম, তাও জানি না।

—ঠিকই এসেছিস, আমি আসছি— তোরা আরাম কর।

—কী করে বুঝলি ঠিক এসেছি?

—কেন! ড্রাইভার বলল। রাখ, আমি এখনই আসছি।

—বাপ্পা, এই বাপ্পা, বেরো, আমিও তো ঢুকব, না কী?

ব্যাগ থেকে টাওয়েলটা বার করতেই বাপ্পা বেরিয়ে এল। এবার আমি ঢুকলাম, চোখে-মুখে একটু জল দিলাম, হাত-পা ধুয়ে-মুছে বেরিয়ে আসতেই একটা ছোকরা বয়সের আদিবাসী চা আর স্ন্যাক্স দিয়ে গেল। সোফায় হেলানে বসে রয়েছি। হাতে চায়ের ডিশ, চুমুক দিয়েই বাপ্পা বলল, 'বাব্বা, কী চা রে— চেখে দেখ, এই, কানু কোথায় রে— কী বলল?'

—আসছে বলল তো।

বলতে বলতেই বাইরে গাড়ির শব্দ। গাড়িটা থামল, কানু এসে ঢুকল, একটা খাটে বসল। বলল, 'ডিউটি সেরে এলাম একবারে। দু'-চার দিনের মধ্যেই বোনাস দেওয়া হবে তো, তাই কাজের চাপ ভীষণ। আচ্ছা বুম্বা, চা খেয়ে কি আরাম করবি, না একটু ঘুরতে বেরবি? মানে গাড়িটা থাক এখানেই।'

—গাড়ি চেপে ঘুরব? শালা, তুই একটা আস্ত গাধা ছিলি, আর এখনও গাধাই রয়ে গিয়েছিস। এত সুন্দর পাহাড়ি ঝোরা, সবুজের সমারোহ, নীল আকাশ আর সাদা মেঘ ছাড়া সবই তো সবুজ। বাপ্পা, কী করবি, গাড়িতে ঘুরবি?

—না না, গাড়ি আর গাড়ি। ঘড়ঘড় আওয়াজটাকে দূরে রেখে দুটো দিন কাটাতে হবে।

কানু বাইরে গিয়ে ড্রাইভারকে চলে যেতে নির্দেশ দিল। আমরা একে একে বেরবার জন্য তৈরি হলাম। রাস্তায় বেরিয়েই সামনের ঝোরার দিকে এগিয়ে গেলাম। খাড়া পাড় বহু নিচে চলে গিয়েছে। নিচের পাহাড়ি নদীটা দেখা যাচ্ছে না। শুধু ঝমঝম শনশন শব্দে সে তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে চলেছে। ওপারে ঘন সবুজ বনে বনমোরগের ডাক শোনা গেল। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ পাখির কলতান শোনা যাচ্ছে।

কানু— ওইসব পাহাড় ভুটানে। ওপার থেকে চিতা বাঘ এসে এইসব বাগানের বস্তিগুলোতে হানা দিয়ে যায়। গোরু, ছাগল, কুকুর ধরে নিয়ে চলে যায়।

বাপ্পা— তার মানে অনুপ্রবেশ বলতে পারি। বিনা পাসপোর্ট, বিনা ভিসায় রাহাজানির কোনও বিচার নেই তাহলে?

কানু শুধু একটু মুচকি হেসেই আমাকে দেখাল— ওই দেখ, ওই যে যাচ্ছে। দেখলাম মস্ত লেজ নিয়ে বিশালাকার একজোড়া পাখি ভারত থেকে ভুটানে উড়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, কী পাখি ওই দুটো?

—ময়ূর।

আমরা ওখান থেকে চা-বাগানকে বাঁ হাতে রেখে আরও এগিয়ে গেলাম। এবারে এমন একটা জায়গায় পৌঁছালাম, যেখান থেকে পাহাড়ি নদীর জল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কী ভীষণ গর্জন, বাপ রে বাপ, এত দাপট? এইটুকু নদীর!

বাপ্পার আসল নাম হচ্ছে পরিতোষ ঘোষ। ওরা আসলে কলকাতার বাসিন্দা। ওর বাবার ব্যবসার সূত্রে শিলিগুড়িতে আছে। আধা পরিবার এখন তো কলকাতা ২৬-এ থাকে। সাদার্ন মার্কেট-এর একটু পিছনেই ওদের বাড়ি। শিলিগুড়িতে প্রায় আট বছর যাবৎ থাকে, আর তখন থেকেই আমাদের সঙ্গে ওঠাবসা। ওর বাবার লোহার ব্যবসায় মার্কেটিংও দেখে। ও নিজে বলেছে যে, ও নাকি উচ্চমাধ্যমিকটাও পাশ করেনি। বাড়ির কাছেই দেশপ্রাণ শাসমল বিদ্যালয়ে পড়ত আর বাউন্ডুলেপনা করে কলকাতা চষে বেড়াত। ওর মুখের ইংরেজি উচ্চারণ কানে না শুনলে বোঝানো মুশকিল সে মাধুর্যের অনুভূতি। বিমল সেন বলে এক জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিক নাকি ওদের ইংরেজি পড়াতেন। বাপ্পার মুখে ফুল অব ফ্লাওয়ারস-এর মতো আরও অনেক উচ্চারণ শুনতে যে কত মধুর। একবার শিলিগুড়িতে এক ইংরেজ টুরিস্টকে ধরে সে কী কেলো-কীর্তি জানেন! বাপ্পা তো পুরোদস্তুর ইংরেজি জানে, কিন্তু সেই ইংরেজ লোকটার কথা এতটাই জড়ানো আর এতটাই সুর দিয়ে বলে যে, বাপ্পাও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। আর ঠিক এই ব্যাপারটাই লোকটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রিকশায় চাপিয়ে পাড়ার মোড়ে নিয়ে এসেছিল। আমরা সবে ক্লাবের সামনে জড়ো হচ্ছিলাম। লোকটাকে নামিয়ে ক্লাবের বারান্দায় বসিয়ে রেখে একগাদা কাচের মার্বেল কিনে এনেছিল। আমরা শুধু ওর বাজিকরি চালচলন দেখছিলাম। লোকটাকে

> মুম্বই তাজ হোটেলে হামলা করতে আসা জঙ্গিদের ব্যাগগুলো তো এইরকমই ভারী ছিল। তাহলে এটাই ঠিক, ভুটানের জঙ্গলে তো কেএলও সংগঠন ভীষণ সক্রিয়। ওদের অস্ত্র তালিম তো ভুটানের জঙ্গলেই হয়। এরা আবার আলফা, মাওবাদীদের সঙ্গে যুক্ত আছে। তা ছাড়া ওর সঙ্গে যে লোকটা ব্যাগগুলো নিয়ে এল, সে তো নেপালি মনে হল। নেপালি না হলেও রাজবংশী তো হবেই। মোট কথা, মঙ্গোলিয়ান চেহারা। গোলাবারুদ বোঝাই না হলে অন্য আর কী হবে!

মার্বেলগুলো মুখে ঢোকাতে বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে যতগুলো আঁটল, মুখে পুড়ে দিল। লোকটা মাঝেমধ্যেই আমাদের সঙ্গে মুচকি হাসিতে তাল মেলাচ্ছিল। তারপর বাপ্পা ওর সঙ্গে কথা বলছিল। লোকটাও মুখ ভরতি মার্বেল নিয়েই উত্তর দিচ্ছিল। তখন বাপ্পা ওকে বলেছে, 'এখন তোমার কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে।' কোনও ছেলে বাপ্পার কাছে ইংরেজি শিখতে চাইলে বলত, 'কাঁচা সুপুরি চিবিয়ে নিয়ে ইংরেজি বলবি, দেখবি সুন্দর উচ্চারণ হবে'। আমাদেরও সুপুরি চিবিয়ে উচ্চারণ শিখিয়েছে। আসলে বাপ্পা এত শুদ্ধ ইংরেজি আর পদ্য-টদ্য জানে বলেই ওকে আমরা কথায় কথায় ওইদিকে ঠেলে দিই। সবুজ চা-বাগান দেখতে দেখতে এ দিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। বাংলোতে ফিরে এসে আরও একচোট আড্ডা মেরে খাওয়ার সময় হলে বসে পড়লাম। রাতে বেশ শীত করছিল। পরদিন সকাল হতেই কানু তার ডিউটিতে চলে গেল। আমরা অনেকটা বেলা অবধি ঘুমিয়ে নিলাম। বেয়ারা চা দিয়ে বলল, 'আপনারা টিফিন করে যাবেন।' যথারীতি টিফিন তৈরি হলে আমরা খাচ্ছি, এমন সময় কানুও খেতে এসে গেল।

এমনিভাবে সে দিনটা বেশ কেটে গেল। রাত্রে কানু বেশ বারে বারে বাইক নিয়ে কোথায় যেন যাতায়াত করল। জিজ্ঞেস করতেই বলল, 'বোনাসের টাইম তো, তাই একটু ডাকাতি-ফাকাতির ভয় থাকে বলে আলাদা ধরনের কাজ করতে হয়।' রাত দশটার সময় তিনটে বড় বড় ব্যাগ এনে ওর ঘরে রেখে দিল। ব্যাগগুলো খুব ভারী বলে মনে হল। আমার বেশ সন্দেহ হওয়াতে বাপ্পার সঙ্গে আলোচনা করলাম। চা-পাতা ভরতি হলে তো এত ভারী হবে না! তাহলে ও কোনও চোরাকারবারে যুক্ত নেই তো! থাকতেও পারে। নাকি কোনও অস্ত্রশস্ত্র আছে! মুম্বই তাজ হোটেলে হামলা করতে আসা জঙ্গিদের ব্যাগগুলো তো এইরকমই ভারী ছিল। তাহলে এটাই ঠিক, ভুটানের জঙ্গলে তো কেএলও সংগঠন ভীষণ সক্রিয়। ওদের অস্ত্র তালিম তো ভুটানের জঙ্গলেই হয়। এরা আবার আলফা, মাওবাদীদের সঙ্গে যুক্ত আছে। তা ছাড়া ওর সঙ্গে যে লোকটা ব্যাগগুলো নিয়ে এল, সে তো নেপালি মনে হল। নেপালি না হলেও রাজবংশী তো হবেই। মোট কথা, মঙ্গোলিয়ান চেহারা। গোলাবারুদ বোঝাই না হলে অন্য আর কী হবে! কানু তো এখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। অন্য কোনও ব্যবসা ও করে না। আমরা শেষে কোনও ঝামেলায় ফেঁসে যাব না তো! আমার তো ভয় করতে লাগল। দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম একরকম উবেই গেল। শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, সকালে উঠেই চলে যাব। যাক, কোনওরকমে সকাল হল। কানুকে কী বলব! আসল কথাটা বলা যায় না যে! ও তো বন্ধু, ও কী করবে, সেটায় মত দেওয়াটা ঠিক হবে না। বলব বলব করছি, কিন্তু বলতে আর পারছি না। বাপ্পার দেখছি খুব একটা হেলদোল নেই। বেশ আনন্দেই আছে। কানু শুধু বলল, 'আমাকে একটু মালবাজার যেতে হচ্ছে। তোরা ঘোরাফেরা কর, কাল তোদের ভুটানে নিয়ে যাব।'

এবার আমি আরও একটু নিশ্চিন্ত হলাম যে, ওই ব্যাগ ভরতি গোলাবারুদ নিয়ে ভুটান যাবে। বাপ্পাকে বললাম, 'দেখলি তো! মালগুলো ঠিক ভুটানে পাচার হবে।'

—দূর খেপা, চুপ থাক তো। অয়েল ইয়োর ওন মেশিন।

সারাদিন গিয়ে কানু প্রায় পাঁচটার দিকে মালবাজার থেকে ফিরে এল। আমি বাপ্পার ধমক খেয়ে আরও চুপসে গিয়েছি। এবার ওকেও কিছু বলতে পারছি না। ভদ্রতা দেখাতেই কানুকে বললাম, 'আমরা তোর জন্য ওয়েট না করেই খেয়ে নিয়েছি। তোর এখানকার স্টাফগুলো খুবই পীড়াপীড়ি করছিল কি না। তুই খেয়ে নে।' কানুকে বিকেলবেলায় কেমন যেন চিন্তিত দেখাচ্ছিল। খুব একটা কথাবার্তা বলল না। ভাবলাম, চিন্তা তো থাকবেই। একে তো অতিথি, তারপর কোম্পানির কাজের চাপের সঙ্গে অস্ত্রপাচারের ব্যবসা। একটু এদিক-ওদিক হলেই একেবারে ধপাস, জীবনটাই পাহাড়ের খাদে ধপাস। বিকেলবেলায় আমরা কোম্পানির জিপে করে জিতি বাগান গেলাম। খুব সুন্দর জায়গা। ওখান থেকে রাস্তাটা ভুটানে চলে গিয়েছে। এ দিন রাতে খানিকটা ঘুম হল বটে। সকালে উঠে আবার সেই দুশ্চিন্তা। ওদিকে কানু নাকি বোনাস পেমেন্টে ব্যস্ত থাকবে। যথারীতি আমাদের কোথাও ঘুরে আসতে বলে কাজে চলে গেল। আমরা নাগরাকাটা হয়ে চলে গেলাম চেংমারি চা-বাগানে। চেংমারি এশিয়ার বৃহত্তম চা-বাগান। বাগানটা ঘুরে দেখলাম। শুনলাম, এখান থেকেও ভুটানের ছোট্ট একটা বাজারে যাওয়া যায়। বাপ্পার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমাকে সেই একই দুশ্চিন্তা কুরে কুরে খাচ্ছিল। ফলত, ওদিকে পা বাড়াইনি।

সারাদিন ঘুরে আমরা বাংলোতে গিয়ে দেখলাম, কানু সবে কাজ থেকে ফিরে চায়ের সঙ্গে একটা খবরের কাগজ নিয়ে বসেছে। আমরাও একটু ফ্রেশ হয়ে আড্ডায় বসলাম। রাতে বেশ একটু সময় বাইরে হাঁটাচলা করব ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম চাঁদের আলোয় যদি চিতার দেখা পাই। ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনতে শুনতে চা-বাগানের রাস্তায় হাঁটব। তা আর যাওয়া হল না। না হলেও বারান্দায় বসেই ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। চাঁদের সামান্য উপস্থিতি আছে, যা পশ্চিম আকাশ থেকে চা-বাগানে ছটা বিতরণের ব্যর্থ চেষ্টা করছে। আমরা বাংলোর বারান্দায় শান্ত পরিবেশে তিন বন্ধু হেলানে বসে রয়েছি। কানু কিছু বলবে এমন

সময় বাপ্পা ওর থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'দেখ, আমরা তোকে জানিয়ে-টানিয়ে এলাম, আর তুই কিনা...'

—আরে, হয়ে গিয়েছে। আমার কাজের ঝামেলাগুলো আজ প্রায় পুরো সমাধা হয়ে গিয়েছে। কাল থেকে তোদের সঙ্গে ঘুরব-ফিরব, সময় দেব। তোরা তো পরের চাকরি করিস না। কী করে বোঝাব বল, এর জ্বালা যে কী! আজ আর কাল— এই দুটো দিনের নামচাটা শুধু বলছি শোন। তাহলেই খানিক বুঝতে পারবি। কাল সকালবেলায় অফিসের দু'-দুটো তোরঙ্গ খালি করা হয়েছে। তারপর আমি জিপে চেপেছি আর একটা লরিতে পাঁচজন চৌকিদার চেপে গেলাম মালবাজার স্টেট ব্যাঙ্কে। সেখানে টাকাপয়সা রেডি করে তোরঙ্গের মধ্যে সাজিয়ে তালা মারলাম। তারপর ওরা সেই পনেরো লাখ টাকা, যার প্রায় সবই খুচরো, মানে সব ধরনের নোট ভরতি তোরঙ্গগুলো জিপে ধরাধরি করে লোড করেছে। আমি শুধু একটা রিভলভার নিয়ে অতগুলো টাকা নিয়ে আগে আগে আসছি আর চৌকিদাররা তির-ধনুক আর বন্দুক নিয়ে পেছন পেছন পাহারা করে আসছে। চালসা পর্যন্ত তেমন একটা ভয় নেই। তারপর চাপড়ামারি জঙ্গল যখন অতিক্রম করছিলাম, তখন আমি অন্তত চৌকিদারদের বুকের ভিতরকার ক্রিয়াকলাপ ভালই আঁচ করেছি। ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে চাপড়ামারি পার হয়ে এলেও কোনও ডাকাতের দেখা পাইনি। কুর্তি এসে টাকার বোঝাগুলো বড় সাহেবের চেম্বারে রাখা হল। তারপর পাহারাদার নিযুক্ত করলাম। খিচুড়ি আর তরকারি রান্না করে খাবে আর সারারাত পাহারা দেবে— এই চুক্তিতে জনা বিশেক লোক নিয়োগ করি। মাংস করলে ওরা হাড়িয়া বন্দোবস্ত করবেই, আর হাড়িয়া খেয়ে চিৎ হয়ে পড়বে। ডাকাত এলে তখন প্রতিহত করার বদলে সহায়তা করবে— এতে অবাক হবার কিছু নেই। কাজেই মাংস খাওয়ানো হয়নি। বলেছি, কাম পুরা করো, বাদ মে হাড়িয়া দিয়া জায়েগা। রাত্রে পাহারার জন্য ওরা সত্যি কোনও গাফিলতি করেনি। এ এলাকার কয়েকটা বাগানের মধ্যে তিরন্দাজ বলতে পাটু হচ্ছে বিখ্যাত। পাটু তির দিয়ে বাঘও মেরেছিল। টায়পা নামে এক প্রৌঢ়, সে তো এক সময় ভুটান থেকে প্রত্যেক রবিবার জংলি শুয়োর মেরে আনত। এইরকম সব বাঘা বাঘা প্রহরী কেউ ডালা, কেউ বন্দুক, কেউ লাঠি নিয়ে সারাটা রাত পনেরো-ষোলো লাখ টাকা পাহারা দিয়েছে। ডাকাত যদিও আসেনি। তা বলে পরিশ্রম তো আর কম হয়নি! সকাল থেকে কেউ ধনুকে তেল মেখে রোদ খাইয়েছে, কেউ বা তিরগুলো পাথরে ঘষে চকচকে করেছে। ধনুকের ছিলায় এরণ্ডর তেল ঘষে ছিলাকে নমনীয় করেছে। কেউ বা ভাল ধার করে রেখে দুপুরের খাওয়া সেরে এক-দু'দণ্ড নিদ্রাদেবীকে আসন পেতে দিয়েছে। হাজিরা খাতায় উপস্থিত থেকেও ছুটি পাওয়াটা যে আলাদা আমেজ তা কি বলতে? এত করে পাহারা দিয়েও সকালবেলায় আমি না যাওয়া অবধি সবাই অফিস বারান্দায় বসে ছিল। আমি যেতেই এককেজন বাক্‌কৌশলে আমার কাছে পনেরো লক্ষ টাকা রক্ষা করার বীরত্ব জাহির করছিল। মনে হচ্ছিল যেন ওই টাকাটা ওরাই রাতারাতি উপার্জন করে আমায় বকশিস দিল। থাক, সেসব অনেক ফিরিস্তি। মোদ্দা কথা হল, তোদের বিদেয় করে দিয়ে আমি বোনাস দেব বলেই গিয়েছিলাম।

—কেন? বোনাস দেওয়া হয়নি? টাকাগুলো কি ছিল না?

—বোনাস তো দিয়েই এলাম। সকাল ন'টা থেকে শুরু করেছি আর এইমাত্র শেষ করে এলাম। আসল তো সেখানে নয়। আসল কথাটা হল, ওখানে ওই তোরঙ্গে তো টাকা ছিলই না। মালবাজার স্টেট ব্যাঙ্কে দু'দিন আগেই চল্লিশটা ইট কিনে রেখে এসেছি, আর কিনেছি এক কিলো পেপার। গতকাল গিয়ে ইটগুলোকে পেপার জড়িয়ে জড়িয়ে লোড করেছি। ওখানে তো আমি একা; ওরা বাইরে অপেক্ষমাণ ছিল। তারপর থেকে তো তালাবন্ধ। ডাকাতি যদিও হয়নি। ডাকাতি হলে তো জমে যেত খেলা। কত না কষ্ট করে, জীবনপ্রাণ যুদ্ধ করে, বয়ে নিয়ে, তালা ভেঙে শুধু ইটগুলোই তো পেত। টাকা তো আমার ঘরে তিনটে ব্যাগে ছিল।

আমি থ হয়ে শুধু কানুর মুখপানে তাকিয়ে ছিলাম, ভাবছিলাম, ব্যাগ ভরতি গোলাবারুদ ছিল না? সে কী!

প্রহেলিকার ডুয়ার্স

১
হেলিকপ্টার থেকে দেখলাম নিচে নদী আর জঙ্গলের মাঝে পনেরোটা রিসর্ট। পাইলট বলল, 'এগুলো সব হাবাবাবুর পরিবারের সম্পত্তি। হাবার ন'টা আর ওঁর বাবার ছ'টা।'
আমি বললাম, 'হাবাবাবু কোথায় থাকেন জানেন?'
হাসিমারা থেকে উড়ে আসা একটা সুখোই বিমানকে সাইড দিতে দিতে পাইলট মুচকি হেসে বললে, 'ওই যে বললাম, হাবার ন'টা। একটা আকার সরিয়ে সাজিয়ে নিন। পেয়ে যাবেন।'
সত্যি কথা বলতে কী, আমি কিন্তু মোটেই পাইনি যে হাবাবাবু থাকেন কোথায়? প্লিজ হেল্প!

২
বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের দুঃখ জেনে কবি চালুক্য তালুকদারের চোখে খুব জল এসেছিল। তিনি সেই জলে লিপস্টিক ঘষে কালি বানিয়ে কবিতা লিখেছেন। সে কবিতার শুরু এইরকম—
সদ্যপাড়া লংকা আর তার ঝালের পিঠে
বসিয়েছি অযোগবাহ বর্ণ।

এইটুকু পড়েই কাব্য সমালোচক বিমূর্ত বিশ্বাস বললেন, 'বুঝেছি বুঝেছি! এ তো দুটো জায়গার নাম। এ কবিতা চলবে না।'
দুটো জায়গার নাম? কোন দুটো একটু বলে দিন না! কবিতায় আমি খুব কাঁচা!

৩
'মামার লজ্জা বাড়ছে। জামায় রং।'
না। এটা অবশ্যই কোনও কবিতার প্রথম লাইন নয়। এটা হল 'মালবাজার' জায়গার নামটা কায়দা করে লেখা। প্রতি শব্দের প্রথম অক্ষর নিলেই বুঝবে। পটলরাম পর্যটক তা-ই জেনে বলল, 'তা-ই বুঝি? তবে বলো দিকি এর মধ্যে কোন নামটা আছে?' বলে উচ্চারণ করল— 'রাগ করু মামা মোরা'।
আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, 'রাকমামো'!
'ঘণ্টা!' বলে পটলরাম পৌনে এক ফুট লেন্স বাগিয়ে ক্যাচালপাড়া লেটারহেড পাখির ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আর জানাল, 'আমার সূত্রটা উলটো, বুঝলে?'
এইবার বুঝলাম। বুঝেছেন নিশ্চয়ই?

গত মাসের উত্তর- ১) রাজাভাতখাওয়া ২) কালচিনি ৩) নাগরাকাটা
প্রথম সঠিক উত্তরদাতা— **সমরেশ মুখার্জি**, বাদু

ব্যাসকূট বসু

উত্তর পাঠান ই-মেল বা ডাক মারফত। সঠিক উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ছাপা হবে আগামী সংখ্যায়। সেই সঙ্গে নতুন ধাঁধা পাঠাতে পারেন আপনিও। তবে তা অবশ্যই ডুয়ার্স সম্পর্কিত হতে হবে।

মধ্য চল্লিশের রাম মিশ্র কনস্ট্রাকশন বিজনেসে ডুয়ার্সের বেশ বড়সড় নাম। সরকারি কাজের বরাত জুটে যায় ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে দহরম-মহরমের জন্যই। সেই কারণেই তার ব্যক্তিগত নেশার ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট সতর্ক, যেমন তিনি খুঁতখুঁতে তার নেশার ব্যাপারেও। যে মেয়েগুলো পেটের দায়ে না এসে স্রেফ ফুর্তি করার জন্য নোট কামাতে আসে তারাই তার প্রথম পছন্দ। যেমন ইঞ্জিনিয়ার বাবা ও ডাক্তার মায়ের একমাত্র কন্যা মনামী তার উঠতি যৌবনে শরীর নিয়ে অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালবাসে। অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারের বাড়িতে যিনি রান্নাবান্না করেন তার নিরীহ তরুণ ছেলেটি দিনকয়েক হল নিখোঁজ। এইভাবেই ধাপে ধাপে ফুটে উঠছে ডুয়ার্সের অন্ধকার ছবি।

অরণ্য মিত্র

৪

ডুয়ার্সের প্রভাবশালী যুবনেতা নবেন্দু মল্লিক সাদা পায়জামা আর পাঞ্জাবি ছাড়া আর কিছু পরেন না। সঙ্গে জুতো। জুতোর দাম সাত হাজার। দুটো মোবাইলের একটার আকার প্রায় স্লেটের সমান। কাশিয়াগুড়ির নবেন্দু এখন ফালাকাটায় বাড়ি ভাড়া করে থাকেন। বাড়ির গ্যারেজে লাল রঙের সুইফ্‌ট। এ ছাড়া একটা রয়্যাল এনফিল্ড কিনেছেন তিনি। কখনও কখনও সেটা নিয়ে ফালাকাটা থেকে কাশিয়াগুড়ি আসেন গম্ভীর ডিগ ডিগ শব্দ তুলে। নবেন্দুর বাবার গালা মালের দোকান ছিল কাশিয়াগুড়ি হাটে। কলেজে ভরতি হয়ে নবেন্দুর ডানা গজায়। রাজনীতি করতে শুরু করেন। প্রথমে কলেজের এজিএস। পরের বছর জিএস। পরীক্ষা না দিয়ে দু'বছর বেশি কাটিয়েছিলেন জিএস পদ আঁকড়ে থাকার উদ্দেশ্যে। ব্লকের যুব প্রেসিডেন্ট হওয়াটা এর পর স্রেফ অপেক্ষার ছিল, কিন্তু আচমকা একটা ধর্ষণ আর খুনের মামলার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ার কারণে তাঁকে তিন মাস আত্মগোপন করে থাকতে হয়। সেসব এখন চাপা পড়ে গিয়েছে বটে, তবে এখনই তাঁকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না।

বড় মাপের নেতাদের সঙ্গে বেজায় দহরম মহরম নবেন্দুর। কলকাতা থেকে ভারী কেউ এদিকে এলে প্রথমেই নবেন্দুকে ফোন করে জেনে নেয় ভুটানের হুইস্কি পাওয়া যাবে কি না। প্রেসিডেন্টের পদ ফসকে গেলেও নবেন্দু মল্লিককে একটা সমবায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

গত দু'দিন ফালাকাটায় ছিলেন না নবেন্দু। কোথায় ছিলেন বলা মুশকিল। কাল অনেক রাতে ফিরেছেন। সকাল দশটাতেও তাঁকে বাইরে দেখা যায়নি। বাইরের ঘরে কয়েকজন দর্শনার্থীর সঙ্গে সফি মিয়াও বসে ছিল। সে জানে নবুদা এখন ফ্রেশ হচ্ছে। আসার আগে ফোন করেছিল সফি। যদিও সে নবুদার চাইতে বিশ বছরের বড়, কিন্তু কাছের লোকেরা সবাই নবেন্দু মল্লিককে নবুদা বলে ডাকে। সফি হাটে হাটে 'উত্থান তৈল' আর 'বীজবটিকা' বিক্রি করে। এগুলো জাপানি তেল আর রকেট বড়ির দেশি সংস্করণ। হাটে হাটে ভালই চলে। এ ছাড়া রকমারি সালসা, গাছের শিকড়, মাদুলি... এসব তো থাকেই।

সওয়া দশটা নাগাদ ভিতর থেকে সফি মিয়ার ডাক এল। বসার ঘরের পরেই একটা ছোট ঘর। এসি লাগানো। তবে এই শীতে এসির দরকার নেই বলে নবুদা জানালা খুলে দিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে দু'হাতে মোবাইল ধরে কিছু একটা দেখছিলেন। সফি মুখোমুখি বসে বলল, 'কবে আসলেন দাদা?'

'কাল রাতে। হেভি চাপ বুঝলেন? লোকে ভাবে পলিটিক্স করলে কোনও লেবার দেবার দরকার নেই। এদিকে যে আমাদের পোঁদের তেল বেরিয়ে যায়, সেটা বোঝে না।'

'পাবলিকের কথা ছাড়েন দাদা।'

'ছাড়ব মানে? এ কি আপনার উত্থান তেলের ব্যবসা? পলিটিক্সে পাবলিকই সব। পাবলিক খাবে, ঘুমোবে, আপনার তেল মেখে লাগাবে। এসব শান্তিতে করতে না পারলে ভোট দেবে কেন? যাক গে! খবর কী?'

'এমনিতে খবর বিশেষ নাই। তবে আপনার এলাকায় একটা ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'আরে, আমার এলাকা কী হে? আমার গ্রাম বলেন। শ্যামলকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফোন অফ। আজ আমি গ্রামে যাব। শ্যামলের মায়ের সঙ্গে কথা বলব। তবে আমার কাছে খবর আছে, ব্যাটা বিয়ে করে ভেগেছে।'

'ছেলেরা ভাগবে কেন দাদা?'

'নেপালি মেয়েকে বিয়ে করেছে। বাড়িতে মেনে নেবে ভেবেছেন?'

সফি একটু অবাক হয়ে বলে, 'নেপালি মেয়ে? কিন্তু শ্যামল তো এলাকা ছেড়ে তেমন কোথাও যেত না!'

'তা যেত না। তবে মেয়েটা তো প্রায়ই আসত ধূপগুড়িতে।' নবেন্দু মল্লিক লম্বা সিগারেট ধরিয়ে ফেলেন। ছোট ঘরটা ধোঁয়ায় ভরিয়ে দিয়ে বলেন, 'শ্যামলের মাকে বোঝাতে হবে। এখনও তো ব্যাপারটা মিডিয়াতে আসেনি তা-ই না?'

'টিভি-কাগজে কিছু বেরয়নি।'

'আগে থেকেই লোকজন জানিয়ে পুলিশে রিপোর্ট করে লোক হাসানোর কোনও মিনিং নেই।'

সফি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তখনই ফোন এল নবেন্দু মল্লিকের ছোট ফোনটায়। তিনি নাম্বারটা একবার দেখে মোবাইলটা কানের সামনে এনে বেশ জোরে বললেন, 'হ্যাল্লো!'

'দৈনিক ভোরবেলা থেকে বলছিলাম দাদা।'

ফোনের ওপারের গলা শুনতে পাচ্ছিল সফি। নবেন্দু মল্লিকের চোখ দুটো একটু ছোট হয়ে গেল। মুখে ফুটে উঠল বিরক্তির রেখা।

যাত্রীদের মধ্যে একজনের জন্য একটা মেরুন রঙের মারুতি ওমনি অপেক্ষা করছিল। যে একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে সে গাড়িতে উঠল, তার পরনে ঘন জংলা সবুজ রঙের প্যান্ট আর নীল জ্যাকেট। ধূসর একটা চাদরে বুক আর মাথা জড়ানো। শীত যে তেড়ে পড়েছে এমন নয়। লোকটি সম্ভবত দক্ষিণের। মারুতি গাড়িটির চালক ট্রেন আসতেই স্টার্ট দিয়ে রেখেছিল। লোকটি উঠে বসতেই চলতে শুরু করল। রাস্তাঘাট ফাঁকা। মিনিটকয়েকের মধ্যেই গাড়িটি পাহাড়পুর মোড় থেকে জাতীয় সড়কে উঠে পুবে বাঁক নিয়ে বেশ জোরেই ছুটতে শুরু করে দিল।

তিনি একটু বিদ্রূপ গলায় মিশিয়ে বললেন, 'সমবায় নিয়ে লিখেছেন দেখলাম! সবই তো বিরোধী পক্ষের কথা। আমার একটা বাইট নিলে ভাল হত না?'

'দু'দিন ফোনে ট্রাই করেছি দাদা! আপনাকে পাইনি।'

নবেন্দু মল্লিক একটু নরম হয়ে বললেন, 'বলুন কী জানতে চান? অবশ্য বলার কিছু নেই। আমি দায়িত্ব নেবার পর সমবায়ের উন্নয়ন দেখে বিরোধীদের হিংসা হয়েছে। হিংসা খুব বাজে জিনিস। এতদিন প্রচুর দুর্নীতি হত। সেসব বন্ধ করে দিয়েছি। এতে যদি বিরোধীদের কেউ কেউ গালিগালাজ করে, তবে আমার কিছু বলার নেই।'

'ব্লক প্রেসিডেন্টও তা-ই বলেছিলেন। আমরা লিখেছি সেটা।'

'ভাল করেছেন। আপনারা ঠিকমতো লিখবেন না তো কে লিখবে? পয়লা জানুয়ারি সমবায়ের মিটিং-এ চলে আসবেন। ভাল প্যাকেট থাকবে।'

'আরেকটা ব্যাপারে একটু জানার ছিল।'

'বলুন।'

'আপনার গ্রাম কাশিয়াগুড়ির একটা ছেলে মিসিং। নাম শ্যামল।'

এলিয়ে পড়া ভাবটা ঝেড়ে ফেলে নবেন্দু মল্লিক সোজা হয়ে বসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এটা কোনও খবরই না। ছেলেটা একটা নেপালি মেয়েকে বিয়ে করে ভেগেছে। সব মিটলে ফিরে আসবে।'

ফোনটা কেটে দিলেন তিনি। তারপর সফির দিকে তাকিয়ে ধমকের সুরে বললেন, 'মিডিয়ার কাছে চলে গেল কী করে বলুন তো? কে কার সঙ্গে ভাগবে, সে নিয়েও স্টোরি লিখবে নাকি বাঞ্চোদগুলো?'

৫

ডিসেম্বরের ভোর পাঁচটা মানে প্রায় অন্ধকার। জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসের তিস্তা অংশটা মিনিট পাঁচেক হল শেয়ালদা থেকে পাড়ি দিয়ে ঢুকেছে। যাত্রীদের মধ্যে একজনের জন্য একটা মেরুন রঙের মারুতি ওমনি অপেক্ষা করছিল। যে একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে সে গাড়িতে উঠল, তার পরনে ঘন জংলা সবুজ রঙের প্যান্ট আর নীল জ্যাকেট। ধূসর একটা চাদরে বুক আর মাথা জড়ানো। শীত যে তেড়ে পড়েছে এমন নয়। লোকটি সম্ভবত দক্ষিণের। মারুতি গাড়িটির চালক ট্রেন আসতেই স্টার্ট দিয়ে রেখেছিল। লোকটি উঠে বসতেই চলতে শুরু করল। রাস্তাঘাট ফাঁকা। মিনিটকয়েকের মধ্যেই গাড়িটি পাহাড়পুর মোড় থেকে জাতীয় সড়কে উঠে পুবে বাঁক নিয়ে বেশ জোরেই ছুটতে শুরু করে দিল। শেষ রাত থেকে সকাল আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত জাতীয় সড়কে গাড়ি খুব একটা থাকে না। এই সকালে তো আরও নেই। ফলে ড্রাইভার বেশ জোরেই চালাচ্ছিল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লাটাগুড়ি পেরিয়ে অরণ্যের মধ্য দিয়ে রাস্তাটা ধরে খানিকটা এগিয়ে বাঁক নিল মূর্তির দিকে। এই এক ঘণ্টা চালক আর আরোহীর মধ্যে কোনও কথা হয়নি। দু'জনে অবশ্য পাশাপাশিই ছিল। মূর্তির সেতু পেরিয়ে থমথমে অরণ্য ঘেরা সরু রাস্তাটায় গাড়িটা উঠতে আরোহী প্রথম কথা বলল।

'এবার এই গাড়িটা এনে ভাল করেছেন। এই মডেল গ্রামেগঞ্জে খুব কমন। গতবার যে গাড়িটা এনেছিলেন, সেটা কোথায় কোথায় গিয়েছিল, তা জানতে চাইলে পুলিশের বেশি সময় লাগবে না।'

চালক কোনও কথা না বলে একটু হাসল।

'এবার ক'পিস?' আরোহী জানতে চাইল।

'ফোর। একটু মেপে স্টেপ ফেলতে হচ্ছে বুঝলেন? মাসকয়েক আগে একটা পিস কী করে জানি ভেগে যায়। অবশ্য আমাদের কন্ট্রাক্ট ছিল না। বিহারের এক পার্টি চার্জে ছিল। রায়গঞ্জের একটু আগে পিসটা গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে।'

'কেন?'

'পার্টি ফোনে কথা বলছিল বিহারে। দেশোয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজে। কিন্তু মেয়েটা সে ল্যাঙ্গুয়েজ জানত। আদিবাসী তো!'

'পুলিশ?'

'কাউকে ধরতে পারেনি। কারণ মেয়েটা গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে হেভি চোট পেয়েছিল। তিন দিনের মাথায় ডেড।'

আবার চুপচাপ চলতে লাগল তারা। খুনিয়া মোড়ের দিকে এগিয়ে যাওয়া সরু রাস্তায় মাঝেমধ্যেই বাঁক নেওয়ায় তেমন জোরে চালানো যাচ্ছিল না গাড়িটা। আরোহী চুপচাপ অরণ্যের গাছপালা দেখতে লাগল। আরও আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল গাড়িটা নাগরাকাটা হয়ে থানঝোরা রোড ধরে উত্তরে ছুটছে। হালকা রোদ্দুর ওঠায় চারপাশের প্রকৃতি খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিছু দূরে পাহাড়। জমি ঢালু হয়ে নেমে এসেছে সামনে। চা-গাছে বোঝাই ঢালগুলো অপূর্ব। কিন্তু আরোহীর মাথায় সেই দৃশ্য কোনও রেখাপাত করছিল না। জিতি চা-বাগানের একটু আগে একটা বড় গাছের নিচে দাঁড়াল গাড়িটা। ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা। সামনেই ছোট্ট একটা চা-বিস্কুটের দোকান। মুখোমুখি বাঁশের বেঞ্চে তিন-চারজন চা খাবে বলে অপেক্ষা করছিল। গাড়িটা দেখে তাদের মনে কোনও কৌতূহল দেখা গেল না। গাড়ির চালক আর গাড়িটিকে তারা চেনে। একজন কেবল ইশারায় চালকের কাছে গাড়ির আরোহীর পরিচয় জানতে চাইল।

'টুরিস্ট হ্যায় এতোয়া! কলকাত্তা সে আয়া।'

ওদিক থেকে আর কোনও কৌতূহল দেখা গেল না। চালক রাস্তা ধরে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মোবাইল বার করে ফোন করল। কয়েকটা রিং-এর পর ওপাশ থেকে একটা পাতলা গলা শোনা গেল, 'হ্যালো!'

'চায়ের দোকানের সামনে আছি। তাড়াতাড়ি এসো।'

'আন্দই ছ মো।'

চালক ফোন কেটে দিয়ে আবার দোকানের সামনে ফিরে এসে দু'গেলাস চায়ের অর্ডার করে আরোহীর উদ্দেশে একটু জোরেই বলল, 'চঞ্চল থাপা আসছে। এবার আর গাইড নিয়ে কোনও টেনশন নেই।'

চঞ্চল থাপা স্থানীয় ছেলে। সে পর্যটকদের গাইড হিসেবে কাজ করে। চায়ের দোকানে বসে থাকা লোকগুলো এটা জানে। চেনা একজন একটা কাজ পেল শুনে ওরা খুশিই হল। এটাই ওদের সারল্য। যদি একটু জটিল হত তাহলে হয়ত বুঝতে পারত, শীতের সকালে এমন চমৎকার পরিবেশে যা ঘটছে, তা ওই প্রকৃতি আর তাদের মতো সরল নয়।

চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। গাড়ি ফিরতে শুরু করল নাগরাকাটার দিকে। এবার আরোহী বসল পিছনে। চালকের পাশে চঞ্চল থাপা। ছোটখাটো চেহারা। গায়ের রং তামাটে। নীল জিন্‌স আর চামড়ার জ্যাকেটটা বেশ চকচকে হলেও জুতোটা সস্তার গোল্ড স্টার।

'কাল জলপাইগুড়ি রোডে ট্রেন ধরিয়ে দেওয়ার দায়িত্বটা তোর বুঝলি?' চঞ্চলের দিকে একবার তাকিয়ে বলল চালক। 'এর পর কয়েক মাস তুইই এই দায়িত্বটা সামলাবি। আমি বনগাইগাঁওয়ের লোড নিতে কাল সকালে বেরিয়ে যাচ্ছি।'

আরোহী মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হল। বনগাইগাঁও যাওয়ার ব্যাপারটা বলার কোনও দরকার ছিল না।

আরোহীর নাম বিজু প্রসাদ। চালকের নাম সুখান লাকড়া।

৬

গ্রিন রিসর্টের ম্যানেজার বিনয় দত্ত দশ বছরে অনেক দেখেছেন। রিসর্টটি একটু দামি। কোনও ঘর নেই। তার বদলে ছ'টা ছোট ছোট বাড়ি। দু'কামরার। সিজনে খালি পাওয়া মুশকিল। বিরাট জমির উপর গাছপালায় সাজানো-গোছানো গ্রিন রিসর্টের ক্যাম্পাস থেকে একটু নিচে জলঢাকা দেখা যায়। এ ছাড়া পাহাড়, চা-বাগান, অরণ্য সবই ঘিরে আছে জায়গাটিকে। একটু আগে রাম মিশ্রর ফোন এসেছে। চালসা পর্যন্ত এসে গিয়েছেন। তার মানে বড় জোর আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসবেন গ্রিন রিসর্টে রাম মিশ্রর মতো কাস্টমার অবশ্য ওই আধ ডজন বাড়ির কোনওটাতেই থাকেন না। ক্যাম্পাসের এক প্রান্তে বাংলো ধাঁচের একটা বাড়ি আছে বাঁশ আর কাঠ দিয়ে বানানো। খড়ের ছাউনি, কিন্তু মেঝেটা পাকা। সেটা মালিকের গেস্ট হাউস। গেস্টদের কাছ থেকে বিনয় দত্ত কোনও পয়সা নিতে পারেন না। তবে তিনি জানেন যে, গেস্ট হাউসের কাস্টমাররা অন্যভাবে মালিককে পেমেন্ট করে।

রাম মিশ্র মদ্যপান করেন না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে প্রতিবার যে নতুন মেয়ে আসে, তাদের অধিকাংশই তেড়ে পান করতে পারে। বিনয় দত্তর স্টকে উৎকৃষ্ট হুইস্কি আছে কি না খোঁজ নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এখন ভাবছেন, যে মেয়েটাকে নিয়ে মিশ্র আসবেন, সে কেমন হতে পারে। এক মেয়ে নিয়ে মিশ্র দু'বার আসেন না। এ পর্যন্ত যারা এসেছে, তাদের দু'-তিনজন বাদ দিলে পাতে দেওয়ার মতো নয়। এবার কী আসে, সেটা দেখার।

আধ ঘণ্টার মধ্যে কৌতূহল মিটে গেল বিনয় দত্তর। তিনি বরং চমৎকৃত হলেন। গায়ের রং অল্প চাপা হলেও মেয়ে বটে একখানা। এর আগে মিশ্র যাদের এনেছেন, তারা সবাই এর কাছে তুচ্ছ। এখন মেয়েদের হরেক পোশাক হয়েছে। বিনয় দত্ত সেসবের নাম জানেন না। মেয়েটা প্যান্টের উপর যেটা পরেছে, সেটা গেঞ্জির মতো দেখালেও ফিতে বাঁধা আছে কয়েকটা। একটা ফিতে বুকের কাছে। তার ফাঁক দিয়ে বুক দুটোর একটু দেখা যাচ্ছে। বিনয় দত্ত সেটা একবার দেখে নিয়ে চমক কাটিয়ে ম্যানেজারসুলভ হাসিটা উদ্ধার করে বললেন, 'ওয়েল কাম স্যার। গেস্ট হাউস ইজ ওয়েটিং ফর ইউ।'

ইংরেজিতে বলার দরকার ছিল না। সেটা তিনি বললেন মেয়েটার অনারে।

'ডু ইউ হ্যাভ গুড স্কচ?' মেয়েটা যেন মালিক এমনভাবে প্রশ্নটা করল।

'ইয়েস ম্যাম! হ্যাভ সাম গুড কালেকশন ফ্রম ভুটান।'

'প্লিজ সেন্ড উইদ আ ফিউ বটলস অব সোডা।'

তারপর রাম মিশ্রর দিকে তাকিয়ে নরম আর আদুরে গলায় তাড়া দিয়ে বলল, 'তুমি তো আবার আর্লি ওঠো না রামা! আমি কিন্তু আর্লি রাইজার। ভোরবেলা তোমার গাড়িটা নিয়ে আমি কিন্তু ড্রাইভিং-এ বেরুব। আই অ্যাম ক্যারিং মাই লাইসেন্স!'

মেয়ে নিয়ে রাত কেটে যায় বলে রাম মিশ্র পরদিন বেলা করে ওঠেন। তাঁকে এক বাঙালি পুরোহিত বলেছিলেন, 'ভ্রমণে নিয়মো নাস্তি।' সুতরাং রিসর্টে পুজো দেওয়ার কোনও মানে হয় না। ফিরে গিয়ে সন্ধেবেলা হনুমান চালিশা পড়ান পণ্ডিত ডেকে। প্রসাদ খাওয়ান। ফলে পাপ-পুণ্যের একটা ব্যালেন্স ঘটে।

রাম মিশ্র তাই হালকা গলায় জবাব দিলেন, 'এ দু'দিন গাড়ি তোমার! আমি তো শুধু রেস্ট করব সুষমা।'

তার অনেক পরে গেস্ট হাউসের সুকোমল বিছানায় সুষমাকে সবরকম বস্ত্র থেকে মুক্তি দিলেন রাম মিশ্র। সুষমা তখন বেশ খানিকটা হুইস্কি উড়িয়ে দিয়েছে। তার চোখে নেশা এসেছিল। সেই নেশার দিকে তাকিয়ে জেগে উঠছিলেন রাম মিশ্র। তিনি

গায়ের রং অল্প চাপা হলেও মেয়ে বটে একখানা। এর আগে মিশ্র যাদের এনেছেন, তারা সবাই এর কাছে তুচ্ছ। বিনয় দত্ত সেসবের নাম জানেন না। মেয়েটা প্যান্টের উপর যেটা পরেছে, সেটা গেঞ্জির মতো দেখালেও ফিতে বাঁধা আছে কয়েকটা। একটা ফিতে বুকের কাছে। তার ফাঁক দিয়ে বুক দুটোর একটু দেখা যাচ্ছে।

সুষমাকে চটকাতে শুরু করলেন। চাটলেন। একটু কামড়েও দিলেন। আন্ডারওয়্যারের ফিতেটায় টান দেওয়ার আগে সুষমার শরীর থেকে একটু উঠলেন বেড সুইচটা হাতে পাওয়ার জন্য।

'লাইট নিবিয়ো না ডার্লিং। আমার আলোতে করতে ভাল লাগে।'

হিস হিস করে বলল সুষমা। রাম মিশ্রর জেগে ওঠা সম্পূর্ণ হল সেই কণ্ঠস্বরে। তিনি হামলে পড়লেন উপুড় হয়ে নিরাবরণ নারীদেহের উপরে।

বোঝা গেল, তাঁর এখনও যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

পরদিন সকালে মিষ্টি রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে বিনয় দত্ত দেখলেন, রাম মিশ্রর গাড়িটা চালিয়ে মেয়েটা ঘুরতে বেরুল। গোলাপি প্যান্টের সঙ্গে উজ্জ্বল নীল জ্যাকেট আর মাথায় হলদে উলের টুপি। বার হওয়ার সময় বিনয় দত্তর উদ্দেশে হাত নাড়িয়ে গুড মর্নিং করে গেল। ফিরে এল প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর। বিনয় দত্ত তখন গাছে জল দেওয়ার কাজ ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন। মেয়েটা গাড়ি পার্ক করে এগিয়ে এল সেদিকে। তারপর নরম সুরে জিজ্ঞেস করল, 'একটু আগে একটা সরু রাস্তা দেখলাম। বাইক যাচ্ছিল। ওটাই তো বিন্দু যাওয়ার একটা শর্টকাট তা-ই না?'

'হ্যাঁ ম্যাডাম। গাড়ি নিয়েও যেতে পারেন। তবে নদী পেরুতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

'চুড়েল কি টিলা বলে কোনও জায়গা...?'

'ওই নদীটার একটু আগে। বিরাট একটা পাথর আছে। আপনার মনে হচ্ছে এদিকটা ভালো জানা?'

বিনয় দত্তর এই জিজ্ঞাসার জবাব দিল না মেয়েটি। 'প্লিজ সেন্ড ফ্রুট জুস উইদ ব্রেকফাস্ট' বলে হাঁটা দিল গেস্ট হাউসের দিকে। চলে যাওয়া সুগঠিত ও আন্দোলিত নিতম্বের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিনয় দত্ত আবার জলসিঞ্চনকর্মের তদারকিতে মন দিলেন।

(ক্রমশ)

বনভোজনের নতুন ঠিকানা চেল লাইন হতেই পারে আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র

পৌষ ফুরিয়ে গেলেও ডুয়ার্স কিন্তু শীতকাতর মাঘেও। এখনও পিকনিকের ভরা মরশুম। কেবল ডুয়ার্স নয়, গোটা উত্তরবঙ্গবাসীই এই সময় বনভোজনে উৎসাহী হয়ে ওঠে প্রবলভাবে। হাতে একটা ছুটির দিন পেলেই হল। দল বেঁধে দে ছুট। পাহাড়ে-জঙ্গলে অথবা নদীর ধারের পরিচিত পিকনিক স্পটগুলোতে ভিড় লেগেই আছে। পশ্চিম ডুয়ার্সও তার ব্যতিক্রম নয়। ঝালং, বিন্দু, লালিগুরাস, রকি আইল্যান্ডের পাশাপাশি গোরুবাথানের ডালিমখোলা, পাপুড়খেতিও তৈরি হয়ে যায় বনভোজনপ্রেমীদের স্বাগত জানাতে। এই শীতের পিকনিক মরশুমে চেনাজানা স্পটগুলি তো রইলই। এর পাশাপাশি বনভোজনের জন্য আকর্ষণীয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে পশ্চিম ডুয়ার্সের অপরিচিত কিছু জায়গা। চেল লাইন পিকনিক স্পট তার মধ্যে অন্যতম।

রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাইলি চা-বাগানের চেল লাইন শ্রমিক বস্তির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে চেল নদী। তারই ধারে এবার বনভোজনকারীদের পাশাপাশি যদি ডুয়ার্স বেড়াতে আসা পর্যটকরাও ভিড় জমান, তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ, চেল লাইনের অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্যের কথা যেভাবে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে এমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। মালবাজার থেকে ডামডিম হয়ে যে পথটি গোরুবাথানের দিকে চলে গিয়েছে, সেই পথে সাইলিহাট পৌঁছে বাঁ দিকে বাঁক নিলেই জেলা পরিষদের রাস্তা। পিচ-ঢালা সরু রাস্তাটি তার ডান ধারে সাইলি এবং বাঁ ধারে রানিচেরা চা-বাগানকে দাঁড় করিয়ে রেখে সোজা পৌঁছে গিয়েছে চেল নদীর ধারে। ওই নদী তার উৎসমুখ থেকে নৃত্যরতা সুন্দরীর মতো একের পর এক পাহাড়ি পথ পরিক্রমা করে অবশেষে গোরুবাথান পেরিয়ে সমতলে নেমেছে। যদিও গোরুবাথান পেরিয়ে এসে চেল নদী এখানে বেশ চওড়া। তার গতিও অনেক শ্লথ। দীর্ঘ পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে যেন কিছুটা ক্লান্ত। তাই চেল এখানে খরস্রোতা নয়, শান্ত। নদীর উত্তর-পশ্চিম দিকে চোখ মেললেই দেখা যায়, ঠিক নদীর ধার থেকেই যেন মাথা তুলেছে গিরিরাজ হিমালয়। তারপর শৃঙ্গর পর শৃঙ্গর ঢেউ তুলে এগিয়ে গিয়েছে উত্তরে আর পশ্চিমে।

অদূরেই ভুট্টাবাড়ির জঙ্গল। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লেই খাবারের সন্ধানে যেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে হাতির দল। তারপর পাহাড় যেখানে নদীর কাছে নতজানু হয়েছে, ঠিক সেই পথ ধরে সোনালি ধানের খোঁজে ছড়িয়ে যেতে পারে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম, এক জনপদ থেকে আরেক জনপদে। আবার নদীর পূর্ব প্রান্তেই রয়েছে প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স ক্লাব। স্থানীয়রা বলেন চেল ক্লাব। চা-বাগানের ব্রিটিশ ম্যানেজারদের জন্য যে ক্লাব তৈরি করা হয়েছিল। সুইমিং পুল, বাস্কেটবল, লন টেনিসের পাশাপাশি বিভিন্ন ইনডোর গেমও এখানে খেলা হত। এ ছাড়া ক্লাবের ঠিক সামনেই রয়েছে সবুজ মখমলের মতো গল্‌ফ কোর্স। এখনও ছুটির দিনগুলিতে বিভিন্ন চা-বাগানের ম্যানেজাররা সাজসরঞ্জাম নিয়ে নেমে পড়েন গল্‌ফ খেলতে। এ ছাড়া ক্লাবের ভিতরে কাঠের তৈরি ডান্স ফ্লোর, পুরনো আসবাব আজও এই ক্লাবের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। যদিও চা-শিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ক্লাবের জৌলুসও অনেকটাই অস্তমিত। তবু চেল নদীর ধারে আদিগন্তবিস্তৃত সবুজের মাঝে লাল ইট রঙের ক্লাবটি চেল লাইনের অন্যতম আকর্ষণ।

মালবাজার থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটারের দূরত্বে এমন এক স্বপ্নের দেশ যে থাকতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত কিংবা ব্লক প্রশাসন যদি চা-বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে চেল লাইন পিকনিক স্পটকে একটি আদর্শ পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলেন, ভ্রমণপিপাসু মানুষ অচিরেই খুঁজে পাবে পর্যটনের এক নতুন ঠিকানা।

কীভাবে যাবেন— মালবাজার, ডামডিম বা সাইলিহাট থেকে ছোট গাড়ি ভাড়া করে যেতে পারেন। তবে গল্‌ফ কোর্স কিংবা ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স ক্লাব ঘুরে দেখতে চাইলে ক্লাব কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।

সুধাংশু বিশ্বাস

নিজের বিয়েতে নিজেই সাজুন

গোটা মাঘ মাসই বিয়ের মরশুম। আর বিয়েবাড়ি মানেই একেবারে অন্য সাজ। তার মানেই যে পার্লারে যেতে হবে তা কেন? তাহলে নিজেকে অনন্যা করে তুলবেন কীভাবে? নিজেই সাজুন বাড়িতে, ঠিক যেভাবে দেওয়া হল টিপস।

চারদিকে সাজো সাজো রব। হলুদ-চন্দন- তাম্বুল একত্রিত করে চলছে বিয়ের মরশুম। হালকা থেকে কনকনে শীতেও চলে সাজ থেকে অতিসাজ। আমরা আধুনিক হলেও বিয়েটা এখনও আমাদের কাছে ট্র্যাডিশনাল। অর্থাৎ কনে-বরের চিরাচরিত রূপটিকে ধরে রাখা। বাঙালিদের মধ্যে এটি বেশি করে অছে। আমরা বোধহয় আমাদের মুখশ্রীকে খুব ভাল করে পড়ে ফেলতে পারি। তাই কোন সাজটা আমাকে বা তোমাকে খুব মানাবে তা নিজেরাই ঠিক করতে পারি সব থেকে ভাল। কতটা সাজলে বা কীভাবে সাজলে সাধারণ থেকে অসাধারণ হয়ে ওঠা যায় বা কতটা কম সাজলেও অপরূপা হওয়া যায়, তা নিয়ে নিজেই কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করা যাক।

আমি যদি একরকম সাজের কথা বলি, তা যে কোনও মুখশ্রী বা রঙের সঙ্গে না-ও মিলতে পারে। তাই সাজটা এমন হওয়া উচিত, যা সবরকম চেহারাতেই মানানসই হবে।

আমার মতে, আমাদের মুখমণ্ডলই বিয়ের দিন বেশি প্রাধান্য পায়, তাই উগ্র মেকআপ না করে গায়ের রঙের সঙ্গে মানিয়ে হালকা ফাউন্ডেশন অথবা বেস মেকআপ করা যেতে পারে। কিন্তু অবশ্যই দেখতে হবে, ফাউন্ডেশনের সঙ্গে শরীরের রঙের সামঞ্জস্য আছে কি না। মুখে যদি ফাউন্ডেশন দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই হাতে, গলায় আর পিঠেও মেখে নিতে হবে। তবে সামঞ্জস্য বজায় থাকা চাই আর ছবির ক্ষেত্রেও তা আবশ্যক।

মুখের পরই আসে চোখ। চোখ দুটো ভাল করে ফুটিয়ে তুলতে পারলে অন্য অনেক কিছুর ঘাটতি আর নজরে পড়বে না। বেশ মোটা করে টেনে কাজল পরলে যে কোনও চোখই সুন্দর হয়ে ওঠে। যদি চোখের সাদা অংশটি বিশালাকৃতি হয়, আর চোখের মধ্যাংশ বাইরে অনেকটাই বেরিয়ে থাকে, সেই চোখে পুরু করে কাজল পরলে কিন্তু ভাল না-ও দেখাতে পারে। মেকআপ করার সময়ই সেটা ভাল বুঝতে পারবেন। চোখের উপর হালকা সোনালি রং ব্যবহার করা যেতেই পারে, তাতে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়। আর চোখের পলক দুটোতে অবশ্যই মাসকারা লাগিয়ে প্রকট করতে হবে, তাতে আরও সুন্দর লাগে। চোখের পরিপূরক আমাদের দুই ভ্রু। চোখ দুটো যতটা সুন্দর করে সেজে ওঠে, ঠিক সেইভাবে ভ্রু দুটোকেও সমান করে ব্রাশ বা আইব্রো পেনসিল দিয়ে আঁকতে হবে। এতেই চোখ দুটো হয়ে উঠবে নজরকাড়া।

এর পর কপালের কাজ— এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার যত বড় কপাল, ততটা জুড়ে তুলি দিয়ে আলপনা আঁকা যেতে পারে ভ্রু দুটো জুড়ে। বড় একটি লাল টিপ পরে তারপর চন্দনের রং দিয়ে সূক্ষ্ম কাজ করা যেতে পারে। যদি ভাল লাগে তাহলে গালের মধ্যিখানেও সামান্য আলপনা আর থুতনিতে দুটো বিন্দু আঁকা যেতে পারে।

বিয়ের দিন চুল নিয়ে অনেক সমস্যা আর জল্পনা দেখা দেয়। চুল ছোট হলেও পরচুল লাগিয়ে বা বাজার থেকে কিনে খোঁপা লাগিয়ে নেওয়ারও এখন কোনও অসুবিধা নেই। আর বড় চুল হলে তো কথাই নেই। কপালের ঠিক উপর থেকে মধ্যিখানে সিঁথি করে দু'দিকে কিছুটা ফুলিয়ে পিছনে একটা বড় খোঁপা করে গোলাকৃতি ফুলের মালা অনেকটা লাগানো যেতে পারে। তাতে চুল ভালভাবে শোভা পায়।

আসল কাজগুলো শেষ হলে গয়না পরার পালা। বাঙালি সাজ হলেই একটু ট্র্যাডিশনাল গয়না ভাল লাগে। তাই পাথর-খোদাই গয়না ছাড়া টিকলি, নথ, কোমরবন্ধনী, ঝুমকো, মালা, চুড়ি, বালা ইত্যাদি অলংকার পরলে রূপসি বাঙালি মনে হবে।

শাড়িটি অবশ্যই বেনারসি হলে ভাল হয়। আটপৌরে করে পরে সেই আঁচল দিয়ে ঘোমটা পরলে ঘরোয়া একটা আভিজাত্য আসে। এর সঙ্গে হালকা লাল ওড়না পরলে আরও সুন্দর দেখাতে পারে। আর বিয়ের সাজে ফুলের মালা তো পরতেই হয়, তাই সুন্দর আকৃতির শোলার মুকুট পরলেই সাজ পরিপূর্ণতা পায়। মেহেন্দি যেহেতু বাঙালিদের পোশাকের সঙ্গে যায় না, তাই লাল আলতা যেমন দু'পায়ে পরতে হয়, সেভাবেই হাতে পরলেও সুন্দর লাগে। নাচের সময় দু'হাতে যেভাবে আমরা আলতা পরি, ঠিক সেইভাবে।

বিয়ের দিন লাল বেনারসিতেই সবাইকে ভাল লাগে। তার সঙ্গে আলতা, নেলপলিশ, সিঁদুর, টিপ, লিপস্টিক— সমস্ত যখন লাল হয়, তখন কনের সাজ অবশ্যই এক অন্য মাত্রায় পৌঁছায়।

অল্প সেজেও সেই সাজ যদি নিখুঁত হয় তাহলে অবশ্যই সাঁঝের আলোয় সকলের কাছে আপনিই অপরূপা।

উইনি রায় কুণ্ডু

শিশু দত্তক নেওয়ার আইনকানুন

এমন বহু দম্পতি আছেন, যাঁরা একটি সন্তানের মুখ দেখবার জন্য কত-না চেষ্টা করেন। পুজোআচ্চা, মানতও দেন। আবার অনেকেই অনাথ শিশু দত্তক নিয়ে দিব্যি সুখী আছেন। তবে হ্যাঁ, পিতামাতাহীন অনাথ শিশু দত্তক নেব বললেই হয় না। এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। সেগুলি জেনে-বুঝে নিয়ে মেনে চলতে হয়। ব্যাস, আর কোনও সমস্যা নেই। দত্তক সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলি জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি জেলার শিশু সুরক্ষা আধিকারিক সুস্মিতা ঘোষ।

দত্তক গ্রহণ

দত্তক গ্রহণ করা বা 'অ্যাডপশন' করার অর্থ কোনও সন্তানকে পরিবারের মধ্যে নিয়ে আসা। বিবাহিত, এমনকি অবিবাহিত নিঃসন্তান কিংবা সন্তান রয়েছে এমন যে কোনও ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মানুষই দত্তক গ্রহণ করতে পারেন।

সাধারণত দেখা যায়, নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান নিতে চান এই ভেবে যে, তাঁদের বৃদ্ধ বয়সে কে দেখাশোনা করবে, তার অথবা উত্তরাধিকার খোঁজার লক্ষ্যে। নয়ত সম্পত্তি কে ভোগ করবে পরবর্তীতে, সেই ভাবনা থেকেও সন্তান দত্তক নিতে চান অনেকে।

কিন্তু দত্তক গ্রহণের মূল লক্ষ্য একটি পরিবারহীন শিশুকে কোনও সুস্থ সুন্দর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া। আশ্রয়হীন শিশু পরিবার চায়, চায় ভালবাসা। প্রতিটি শিশু সুস্থ ও সুন্দর হয়ে গড়ে উঠলে আগামীতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকও সুন্দর ও সুস্থ হয়ে উঠবে।

১) ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে বা মেয়েকে দত্তক নেওয়া যেতে পারে।

২) যাঁরা দত্তক নেবেন, সেই বাবা ও মায়ের বয়স যোগ করে ৯০-এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তার বেশি হলে তাঁরা দত্তক নিতে পারবেন না তা নয়, সে ক্ষেত্রে একেবারে ছোট শিশুকে নিতে পারবেন না। একটু বড় ছেলে বা মেয়েকে নিলে সন্তান ও মা/বাবা সকলেরই সব দিক থেকে সুবিধা হবে। কারণ মা/বাবার বয়স বেশি হলে তাঁরা ছোট বাচ্চার ঝক্কি সামলাতে পারবেন না। এ ছাড়া তাকে বড় করতেও সময় লাগবে। সে ক্ষেত্রে একটু বড় বয়সের সন্তানকে গ্রহণ করাই ভাল হবে সব দিক থেকে।

৩) এ ছাড়া কোনও শিশুর শারীরিক কোনও ত্রুটি বা বিকৃতি আছে এমন শিশুদের দত্তক নিতে চান না অনেকেই। সে ক্ষেত্রে যদি

কোনও বাবা/মা বা পরিবার এইসব শিশুকে নিতে আগ্রহী হন, সে ক্ষেত্রে দেখা হয় এই শিশুদের গ্রহণ করতে বাবা/মা বা পরিবারটি মানসিকভাবে সত্যিই প্রস্তুত কি না। সব দিক ঠিক থাকলে দত্তক দেওয়া হয়। তবে সে ক্ষেত্রে দত্তক গ্রহণের নিয়মাবলি কিছুটা শিথিলও করা হয়।

৪) যে বাবা বা মা সন্তানকে দত্তক নিতে চান, তাঁদেরকে প্রথমে অনলাইন পঞ্জিকরণ করাতে হবে। তাঁদের পরিচয় তথ্যসহ বিশদভাবে জানাতে হবে। অনলাইন পঞ্জিকরণ বা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটে— www.adoptindia.nic.in. দত্তক নেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রেশন করলে এখান থেকেই দত্তক সংক্রান্ত সব তথ্য জানতে পারবেন।

৫) পঞ্জিকরণের পর নির্দিষ্ট সময়ে কোর্টে বা আদালতের আইনি প্রক্রিয়া সমাপ্ত করে দত্তক নিতে সময় লাগে মাস তিনেক। কখনও একটু বেশি বা কম সময়ও লাগতে পারে। দত্তক নেওয়ার আইনি প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর বাবা বা মা তাঁর সন্তানকে পাবেন। দত্তক নেওয়ার পর এনজিও বা বেসরকারি সংগঠনের কর্মীরা লক্ষ রাখবেন, শিশু বা ওই পরিবার পরস্পরকে গ্রহণ করতে পারছে কি না। সেই প্রক্রিয়াটি সমাপ্ত হলে সন্তানটিকে তাঁরা আইনগতভাবে পেয়ে যাবেন। সন্তানটিও তার বাবা/মা ও পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে পেয়ে যাবে।

সবশেষে এটাই প্রত্যাশা রইল, সব অনাশ্রিত শিশুরই যেন নিশ্চিন্ত আশ্রয় ও পরিবার মিলে যায়।

নিয়ম মেনে দত্তক নেওয়ার পরও নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন বাবা/মা। এমনটা হতেই পারে যে, দত্তক শিশুটি বড় হয়ে পালক পিতামাতাকে নিজের করে ভাবতে পারছে না, এমনকি পালিত সন্তান হিসেবে নিজেকে ওই পরিবারের একজন বলে মেনে নিতে পারছে না। এই নিয়েই এক অস্বস্তি চলতে থাকে বাবা/মায়ের মধ্যে। কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে দীর্ঘদিন ধরে দত্তক দেওয়ার কাজটি করে আসছে দু'-একটি বেসরকারি সংস্থা। একটা সময় এমনও একটি ভাবনা ভাবা হয়েছিল যে, দত্তক নিচ্ছেন যেসব পিতামাতা, তাঁদের মধ্যে যদি যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তাঁরা তাঁদের সমস্যাগুলির সমাধানের পথ আদানপ্রদান করে নিতে পারবেন। ভাবনাটি এসেছিল জলপাইগুড়ির সমাজসেবিকা দীপশ্রী রায়ের মাথায়। কিন্তু তা আর শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তার একটা বিশেষ কারণ হল, 'দত্তক নেওয়া'টা সকলেই একটু আড়ালে রাখতে চান। সেটা অবশ্য শিশুটির কথা ভেবেই। কারণ, আমাদের সমাজ এখনও দত্তক নেওয়া শিশুটি যে তার পিতামাতারই সন্তান— এমন ভাবনা স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত করতে পারেনি। তবে আশা রাখা যায়, অদূর ভবিষ্যতে দত্তক শিশুও পরিবারে বড় হবে আর পাঁচটা শিশুর মতোই।

চন্দনা চৌধুরী

এ বিষয়ে আরও কিছু জানতে হলে প্রশ্ন করতে পারেন এই ঠিকানায়— 'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে 'এখন ডুয়ার্স', মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১। ই-মেল- srimati.dooars@gmail.com

টেক টক

নেট ছাড়াই ফেসবুক

ই-দুনিয়ার সঙ্গে এখন কমবেশি সবাই প্রায় পরিচিত। তবু ইন্টারনেটের বিরাট পরিসরের অনেক কিছুই এখনও আমাদের জানা-বোঝার বাইরে। সেগুলির প্রতি আমাদের আকর্ষণ যে শুধু তীব্র তা-ই নয়, জানার আগ্রহও প্রবল। এবার আপনাদের জানাব ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়াই ফেসবুক করা যায়। কীভাবে?

কিছুদিন ধরে ফেসবুক কোম্পানি সংবাদপত্রের পাতা জুড়ে একটি বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। বিজ্ঞাপনটি নিশ্চয় অনেকেরই চোখে পড়েছে। বিজ্ঞাপনে ফ্রি বেসিক ইন্টারনেটের সপক্ষে প্রচার চলছে। অর্থাৎ আপনার মোবাইল ফোনে যদি ইন্টারনেট কানেকশন না-ও থাকে এবং আপনি যদি স্মার্ট ফোনের বদলে সাধারণ ফিচার ফোন ব্যবহার করেন, তবু আপনি ফোনে ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি করতে পারবেন। নিউজ সাইটসহ বিভিন্ন সাইটও সার্ফ করতে পারবেন। তবে এই পরিষেবা হবে টেক্সট-নির্ভর। অর্থাৎ এতে মাল্টিমিডিয়ার (পিকচার, ভিডিয়ো স্ট্রিমিং, সাউন্ড) সুবিধা পাওয়া যাবে না। এই টেক্সট-নির্ভর ইন্টারনেট পরিষেবাকে বলা হচ্ছে বেসিক ইন্টারনেট সার্ভিস বা ফেসবুকের পরিভাষায় ফ্রি বেসিক। যদিও ফ্রি বেসিক নিয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে। বলা হচ্ছে, ফ্রি বেসিক চালু হলে নেট নিউট্রালিটি থাকবে না। তার মানে ওয়েব ব্যবসায় ফেসবুক বা ওই ধরনের কিছু সাইট অন্যান্য কোম্পানির তুলনায় বেশি সুবিধা পাবে।

যা-ই হোক, নেট নিউট্রালিটি ভাল না খারাপ, তার বিচার এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। আমরা বরং জেনে নিই, বেসিক ইন্টারনেট পরিষেবা আদতে ঠিক কী এবং এই টেকনোলজি কীভাবে কাজ করে।

ভারতে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন ৯০ কোটিরও বেশি। কিন্তু স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৯ কোটিও নয়। শুধু তা-ই নয়, একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই দেশে যাঁরা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেন, তাঁদের একটা বড় অংশ অর্থনৈতিক কারণে নেট কানেকশন ব্যবহার করেন না। এই তথ্যটি ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি কোম্পানির পক্ষে মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। কারণ, ভারত ফেসবুকের কাছে একটা বিশাল বাজার। তাই এই দেশে যত বেশি মানুষ তাঁদের ফোনে ফেসবুক করবেন, ফেসবুক কোম্পানির লাভ তত বেশি। তাই যদি এমন কোনও প্রযুক্তি আবিষ্কার করা যায়, যার সাহায্যে ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়াই যে কোনও ফোনে ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি করা সম্ভব, তবে সাধারণ মানুষের কাছে তা যেমন গ্রহণযোগ্য হবে, তেমনি ব্যবসা বাড়বে ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি কোম্পানির।

U2opia মোবাইল কোম্পানির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তথা চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার সুমেশ মেনন দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে ভাবছিলেন। ভারতে বেসিক হ্যান্ডসেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেহেতু ৮০ কোটির উপর, তাই সাধারণ ফোনে গ্রাহকরা ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়াই যদি ওয়েব সার্ফ করতে পারেন, তবে সাধারণ মানুষের যেমন সুবিধা, তেমনি লাভ হবে ওয়েব কোম্পানিগুলির এবং নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডারদের। তা ছাড়া শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও এই প্রযুক্তির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, ওই সমস্ত দেশে অধিকাংশ মানুষ স্মার্ট ফোন কিনতে পারেন না, আর যাঁরা কেনেন, তাঁদের অনেকের ফোনেই নেট কানেকশন নেই।

তবে শেষ পর্যন্ত নতুন কোনও প্রযুক্তি আবিষ্কারের প্রয়োজন পড়ল না। কারণ, প্রযুক্তি আগে থেকেই ছিল। তবে সুমেশের আগে সেটা কারও নজরে আসেনি। এই প্রযুক্তির নাম আনস্ট্রাকচারড সাপ্লিমেন্টারি সার্ভিস ডেটা বা সংক্ষেপে USSD। এতদিন এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হত মূলত মোবাইল ফোনকে টেলিকম সার্ভারের সঙ্গে কানেক্ট করতে। কিন্তু সুমেশ এই প্রযুক্তির সাহায্যে যে পরিষেবা চালু করেছেন, তার নাম Fone Twish। USSD প্রযুক্তি আমরা সাধারণত প্রিপেইড অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স চেক করতে ব্যবহার করি। যেমন এয়ারটেলের ক্ষেত্রে *123#, ভোদাফোনের ক্ষেত্রে *141# ইত্যাদি। এই কোড আমাদের ইন্টারনেট কানেকশন ছাড়াই নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডারের সার্ভারের সঙ্গে কানেক্ট করে এবং আমরা অ্যাকাউন্টের ব্যালান্স চেক করতে পারি। এই প্রযুক্তিতে ডেটা ট্রান্সফারের স্পিড প্রায় থ্রিজি নেটওয়ার্কের স্পিডের সমান। আরও একটি সুবিধা হল, যে কোনও প্রযুক্তির ফোনেই USSD কাজ করে।

এই প্রযুক্তি চালু করার জন্য ফেসবুক, টুইটার, ইয়াহু ইত্যাদি কোম্পানি এবং বিভিন্ন দেশের নেটওয়ার্ক সার্ভিস প্রোভাইডারের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে U2opia কোম্পানির। ভারতে প্রথম বেসিক ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করেছে এয়ারটেল। পরবর্তীতে তাতে যোগ দিয়েছে ভোদাফোন।

তবে আগেই যেটা বলেছি, এই প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই প্রযুক্তিতে ফেসবুকসহ অন্যান্য ইন্টারনেট পরিষেবা শুধু টেক্সট মোডে পাওয়া যাবে। মাল্টিমিডিয়া এবং আপলোড-ডাউনলোডের সুবিধা পাওয়া যাবে না। ফ্রি বেসিক বলা হলেও এই পরিষেবা একেবারে নিখরচায় পাওয়া যাবে না। মাসে প্রায় ৩০ টাকার মতো খরচ পড়বে। Fone Twish অ্যাক্টিভেট করার জন্য ফোনে ডায়াল করুন *325#। যদি পরিষেবা অ্যাক্টিভেট করতে কোনও সমস্যা হয়, তবে কাস্টমার কেয়ারে ফোন করুন।

ইন্দ্রনীল দত্ত

আলুর ডাল

উপকরণ- বড় আলু ১টা, গোটা পেঁয়াজ ১টা, রশুন ৪/৫ কোয়া, ছোট আদা এক টুকরো, লংকা ২টো, সাদা জিরে, তেজপাতা, হলুদ, নুন।

প্রণালী- পেঁয়াজ কুচি, রশুন থেঁতো, আদা ও লংকা বাটা একসঙ্গে কড়াইতে তেল গরম হলে ছেড়ে দিতে হবে। অবশ্য গরম তেলে আগে সাদা জিরে ও তেজপাতা ফোড়নও দিয়ে নিতে পারেন। এর পর ডুমো ডুমো করে কাটা আলুর টুকরো দিয়ে সামান্য হলুদ ও নুন দিয়ে খুব ভাল করে ভাজুন।

ভাজতে ভাজতে আলুগুলো সেদ্ধ হয়ে আসবে। লালচে করে ভাজা হয়ে গেলে সম্পূর্ণ উপকরণের মিশ্রণটিকে মিক্সিতে পেস্ট করে ফেলতে হবে। এবার সেই মিহি পেস্টটাকে কড়াইতে দিয়ে অল্প ভাজা ভাজা করে যতটা ডাল বানাতে চান, সেই আন্দাজমতো জল ঢেলে দিন এবং নাড়তে থাকুন। ডাল ফুটে উঠলে ভাজা সাদা জিরের গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে ফেলুন। রুটি, পুরি, পরোটার সঙ্গে গরম গরম দারুণ জমবে।

মমতা রায়, নয়াপাড়া, ময়নাগুড়ি রোড

বথুয়া শাকের ঘণ্ট

উপকরণ- কয়েক আঁটি বথুয়া শাক প্রয়োজনমতো, আলু, বেগুন, সামান্য চালের গুঁড়ো, কাঁচা লংকা, আদা, সরষের তেল, হলুদ, নুন ও চিনি প্রয়োজনমতো, কালো জিরে ও ফোড়নের উপকরণ।

প্রণালী- বথুয়া শাক ডাঁটা থেকে ছিঁড়ে ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। আলু ও বেগুন ছোট ছোট করে করে কেটে রাখুন। কাঁচা লংকা চিরে নিন। আদা বেটে রাখুন।

কড়াইতে তেল গরম হলে কালো জিরে, কাঁচা লংকা ও ফোড়ন দিন। এবার হলুদ, নুন দিয়ে মাখা আলু ও বেগুন কড়াইতে দিন। বথুয়া শাকগুলি কড়াইতে দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। সামান্য জল ছিটিয়ে ঢাকনা চাপা দিন। আলু, বেগুন ও শাক সেদ্ধ হয়ে এলে ঢাকনা খুলে চালের গুঁড়ো জলে গুলে তাতে আদা বাটা দিয়ে কড়াইতে দিন। সামান্য নাড়াচাড়ার পর যখন দেখবেন ঘণ্ট প্রস্তুত, তখন সামান্য চিনি দিয়ে নামিয়ে নিন।

সরষে শাক চচ্চড়ি

উপকরণ- সরষে শাক দু'-তিন আঁটি, আলু, বেগুন, কালো জিরে, কাঁচা লংকা, নুন, হলুদ, সরষে বাটা ও স্বাদমতো চিনি।

প্রণালী- সরষে শাকের গোড়া কেটে বাদ দিয়ে জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। ফালি ফালি করে আলু ও বেগুন কেটে নিন। কড়াইতে তেল গরম হলে কালো জিরে, কাঁচা লংকা দিয়ে নুন-হলুদ মাখা আলু ও বেগুন ভেজে নিন। এর পর সরষে শাক কড়াইতে দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। সামান্য জল ছিটিয়ে কড়াইতে ঢাকনা চাপা দিন। এর পর সরষে বাটা ছড়িয়ে বা জলে গুলেও দিতে পারেন। সামান্য নাড়াচাড়ার পর কাঁচা সরষের তেল ও সামান্য চিনি দিলেই সরষে শাক চচ্চড়ি রেডি। নামিয়ে নিয়ে পরিবেশন করুন।

বহ্নিলেখা তালুকদার, কোচবিহার

চুলের পরিচর্যায় ভেষজের ব্যবহার

টিপস্ দিচ্ছেন প্রখ্যাত বিউটিশিয়ান মালা দাস

একটা কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা দরকার— মাথার খুসকি থেকে নানা রকম ব্রণ ও ফুসকুড়ি হয়। এর হাত থেকে বাঁচতে মাথার চুল সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। কাড়িপাতা বা মেথির সাহায্যে নারকেল তেল গরম করে সেটা মাথায় লাগিয়ে গরমজলের ভাপের সাহায্যে মাথা ধোবেন। এছাড়া ১৫ দিনে একবার হেনা করবেন। হেনার সঙ্গে টক দই, ডিম, লেবুর রস আমলকির গুঁড়ো, মেথির গুঁড়ো ও চা-পাতার জলের সাহায্যে গুলে মাথায় লাগান এবং এক ঘণ্টা মতো রেখে ধুয়ে ফেলুন। এতে চুলের স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং খুসকির হাত থেকে বাঁচা যায়। এছাড়া ভিনিগার ও চায়ের জল মিশিয়ে মাথা ধুলে চুল উজ্জ্বল হয়। যাদের চুলের আগাটা ফেটে গিয়েছে, রুক্ষ হয়ে গিয়েছে তারা সপ্তাহে এক চা চামচ ভিনিগার, এক চা চামচ গ্লিসারিন, একটা ডিম ও দুই চা চামচ ক্যাস্টর অয়েল এক সঙ্গে গুলে মাথায় লাগান। চুলের উজ্জ্বলতাও সতেজতা নারীর সৌন্দর্যের একটা বিশেষ চাবি কাঠি। ঠাকুমাদের মুখে শুনেছি, চুল ভাল রাখতে কেশুত পাতা, জবা পাতা ও ফুল ও ঘৃতকুমারীর অবদান প্রচুর। তবে কী জানেন যতই বাইরে থেকে ত্বক ও চুলের যত্ন করি না কেন, শরীর যদি ভাল না থাকে তবে কোনও কিছুতেই লাভ হবে না। শরীরের সঙ্গে সব কিছুর সম্বন্ধ। তাই শরীর ভাল রাখতে খেতে হবে ঠিক মতন। সব রকম ত্বক ও চুলের জন্য দরকার প্রচুর জল পান করা। এছাড়া ফল, স্যালাড, সবজিও খেতে হবে। খাদ্য থেকে আমরা প্রচুর পরিমাণে পাই ভিটামিন।

তেলতেল ত্বক যাদের তাদের চর্বি জাতীয় জিনিস খাওয়া উচিৎ নয় যেমন, ঘি, মাখন, চকোলেট ইত্যাদি। পেটটাকে সব সময় ভাল রাখতে হবে। পেট ভাল না থাকলে চোখে মুখে তার ছাপ পরে এবং মুখে নানা রকম গোটা হবে। সুতরাং শরীরকে সব দিক থেকে সুস্থ রাখতে ব্যায়াম করা উচিৎ। ব্যায়াম করলে রক্ত চলাচল ভাল হবে এবং হজম ক্ষমতা বাড়বে। এর ফলে ত্বক ও চুল ভাল থাকবে। ঘুম ভাল হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ব্যায়ামের সাহায্যে শরীর ভাল থাকবে এবং আপনি হয়ে উঠবেন সুস্থ ও প্রাণবন্ত। সুস্বাস্থ্য মনকে করে তোলে সজীব ও স্বচ্ছ।

এই সুন্দর পৃথিবীতে সুন্দরভাবে আছি এবং যতদিন থাকব সুন্দর ভাবে থাকব, এই প্রতিজ্ঞা সকলের করা উচিৎ। ভেষজের সাহায্যে এই চেষ্টা যাতে চালিয়ে যেতে পারেন এই প্রার্থনা রইল।

রূপ পরিচর্যা বিষয়ে প্রশ্ন পাঠান
sahac43@gmail.com এই ইমেল আইডি-তে।

মালা দাস, অঙ্গনা বিউটি ক্লিনিক, শিলিগুড়ি

শীতে নবজাতকের যত্ন

শিশু জন্মানোর প্রথম কয়েক মাস তার বেড়ে ওঠার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। আর এই সময় তার যত্ন নিতে হয় মাকেই। কীভাবে মা শিশুর যত্ন নেবেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করবেন— সে ব্যাপারে শিশু বিশেষজ্ঞর টিপস্।

জন্মের প্রথম এক মাস আর তার মধ্যে প্রথম সপ্তাহটি শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টায় শিশুর পরিচর্যা নিয়ে আমাদের কিছু জেনে রাখা ভাল। আমাদের দেশে বেশিরভাগ শিশুর জন্মের সময় ওজন হয় ২.৫ কেজি থেকে ৩.৫ কেজির মধ্যে। ২.৫ কেজির নিচে ওজন হলে আমরা বলি 'লো বার্থ ওয়েট বেবি'। এদের যত্নের আরও বেশি প্রয়োজন।

জন্মের পর আমাদের প্রথমেই নজর দেওয়া উচিত শিশুর শরীরের সঠিক তাপমাত্রা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা অর্থাৎ সাধারণ ভাবে শিশুকে গরম রাখা। স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৩৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। তাপমাত্রা কমে যাওয়া বা হাইপো থার্মিয়া শিশুর পক্ষে মারাত্মক। শীতে এই সমস্যা আরও বেশি। জামা, টুপি, মোজা পরিয়ে মোটা হাল্কা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে রাখতে হবে। ঘর গরম রাখতে রুম হিটার ভাল। না হলে একটা ২০০ ওয়াটের বাল্ব ঘরে জ্বালিয়ে রাখা যায়।

শিশুর মাথা ছ'মাসের নিচে ন্যাড়া করা উচিত নয়, এতে ঠান্ডা লাগার সম্ভাবনা বাড়ে। কারণ মাথার চুল টুপির মতো কাজ করে। এ ক্ষেত্রে 'ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার' সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা ভাল। জন্মের পর শিশুকে মায়ের বুকের সঙ্গে জড়িয়ে রাখলে শিশু মায়ের উষ্ণতা পায়, গরম থাকে। তাই যতটা সম্ভব বেশি সময় শিশুকে মায়ের কোলে বুকে রাখতে হবে, এতে শিশুর তাপমাত্রা সঠিক থাকবে।

জন্মের পর অনেক শিশুর ত্বক খসখসে হয়, হাল্কা আস্তারণ ওঠে, অনেক সময় হাল্কা গোলাপি ছোপ দেখা যায়। এগুলো স্বাভাবিক ঘটনা, দু'-তিন দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যায়। অযথা তেল বা ক্রিম মাখানোর দরকার নেই। চোখে জল পড়লে বা পুঁজ পড়ে চোখ জুড়ে গেলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো স্যাক ম্যাসাজ করে চোখে অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ দিতে হবে। নাভি থেকে কর্ডটি সাধারণত তিন থেকে সাত দিনে খসে পড়ে। নাভির ক্ষতস্থান শুকনো রাখা দরকার। জল যেন না লাগে খেয়াল রাখতে হবে। শিশুকে জন্মের পর কখনই স্নান করানো যাবে না। নাভি না শুকানো পর্যন্ত জল ঢেলে স্নান না করানোই ভাল। হাল্কা গরম জলে গা মাথা মুছিয়ে দিলেই হবে।

শিশু সাধারণ ভাবে খিদে পেলেই কান্নাকাটি করে। দুধ পেলেই কান্না থেমে যায়। পায়খানা পেচ্ছাপ করে থাকলে বা শীত লাগলেও শিশু কাঁদে। এক সপ্তাহ থেকে তিন মাস পর্যন্ত পেট কুঁচকে কাঁদতে দেখা যায়। এই সবগুলোই স্বাভাবিক কান্না। কোলেও নিয়ে গরম করে দুই খাইয়ে বার্পিং করাতে হবে, যাকে বাংলায় ঢেকুর তোলা বলে। শিশু যদি একটানা কাঁদতে থাকে, স্তন পান না করে তবে তা অস্বাভাবিক কান্না। সেক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন।

শিশু সাধারণত জন্মের পরে পরেই পায়খানা প্রস্রাব করে, অবশ্য তার জন্য যথাক্রমে ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টা অপেক্ষা করা যায়। সুস্থ স্বাভাবিক শিশু সারাদিনে ছ'বারের বেশি প্রস্রাব করে। যদি শিশু শুধুমাত্র মায়ের দুধই পান করে তবে পায়খানার সংখ্যা ও পরিমাণ নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।

জন্মের পর প্রথম সাত দিনে শিশুর ওজন প্রায় ১০ শতাংশ কমে যায়। আবার ১০ দিনের মাথায় সে ওজন ফিরে পায়। এর পরের তিন মাস প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ তিরিশ গ্রাম করে ওজন বাড়ে। জন্মের পর শিশুর প্রথম ও একমাত্র খাদ্য হওয়া উচিত মায়ের বুকের দুধ। নর্মাল ডেলিভারি অর্থাৎ সাধারণ প্রসবের আধ ঘণ্টা পরেই আর সিজারিয়ান সেকশনের দু' ঘণ্টা পরেই স্তন্য পান করানো যায়। মনে রাখতে হবে শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধের আর কোনও বিকল্প নেই। ছ'মাস বয়স পর্যন্ত শিশু শুধুমাত্র মায়ের দুধ খেয়েই থাকতে পারে। ৮৮ শতাংশ জল থাকে বলে আলাদা করে জল খাওয়াতে হবে না। মায়ের দুধে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, মিনারেলস সব সুষম মাপে মজুদ। প্রথম কয়েকদিনের মায়ের দুধকে বলা হয় কলোস্ট্রাম। এটি শিশুর জন্য অত্যন্ত উপকারি। এতে থাকে প্রয়োজনীয় ইমিউনোগ্লোবিউলিন, যা শিশুর জন্য রোগ প্রতিরোধকারী ক্ষমতা গড়ে তোলে। কম ওজনের শিশু যে ভাল করে টেনে খেতে পারে না, তার জন্য পরিষ্কার পাত্রে স্তন দুগ্ধ নিষ্কাশন করে চামচে করে খাওয়ানো যেতে পারে। কর্মরত মায়েরা বুকের দুধ নিষ্কাশন করে শিশুর জন্য রেখে দিতে পারেন, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় দশ ঘণ্টা ও রেফ্রিজারেটরের তাপমাত্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত সঠিক রাখা যায়। পরিশেষে শিশুর সঙ্গে সদ্য প্রসবা মায়ের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দিতে হবে। উত্তরবঙ্গের প্রচলিত রীতিতে দেখা যায় মায়ের এটা খাওয়া বারণ, ওটা খাওয়া বারণ করেন অভিভাবকরা। মাকে পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ সবধরনের খাবারই দিতে হবে। তাতে বুকের দুধ বাড়বে, আর শিশুরও ভাল হবে।

ডা. শান্তনু মাইতি

পরশখানি দিয়ো

জলপাইগুড়ির সরকারি 'হোম' কোরক। এখানে রয়েছে বেশ কিছু ছেলে। সংখ্যায় অন্তত তারা ১৭৫। ওরা সকলেই কোনও না কোনওভাবে দুর্ভাগ্যের শিকার। এরা প্রত্যেকেই হয় বাবা-মা হারা অথবা এদের বাবা-মা থেকেও নেই। কেউ কেউ আবার ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় কোনও না কোনও অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। এদের জন্য রয়েছে দুটো আলাদা 'সেল'। এখানকার এই ছোট ছেলেদেরকেই গান শেখান সীমাদেবী। এই দায়িত্ব তিনি নিজেই একদিন হাতে তুলে নিয়েছিলেন। সীমাদেবী সংগীতের সুযোগ্যা ছাত্রী। পেশাগতভাবে সংগীতেই তিনি সুপ্রতিষ্ঠা পেতে পারতেন, কিন্তু সে পথে না গিয়ে তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ওইসব ছেলের দিকে। প্রথম প্রথম বেশ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হলেও তাঁর অপরিসীম ধৈর্য আর নিরলস সাধনার কাছে কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। ধীরে ধীরে তিনি জয় করেছেন ছোট ছেলেগুলির মন। গান শেখার তীব্র অনীহাকে দূরে ঠেলে এগিয়ে এসেছে ওরা। সুরহীন, তালহীন, লয়হীন ছেলেগুলোকে সুরে আনা সহজ ছিল না। তার উপর ছিল ভাষাগত সমস্যা। নিজের অধ্যবসায় দিয়ে তিনি শেখালেন, কীভাবে গাইতে হয় গান। টিভিতে শোনা চটুল গানের বদলে ওদের গলায় শোনা গেল 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।' প্রথম দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকা ছেলেগুলি আজকাল প্রতি শনিবার অপেক্ষায় থাকে, কখন তাদের ম্যাম আসবে। জমিয়ে রাখে বিশেষ উপলক্ষে পাওয়া চকোলেট ও বিস্কুট। আর ম্যামও হাত ভরে নিয়ে আসেন নানা ধরনের খাবার। এভাবেই দূরত্ব কমে। সুর-তাল-ছন্দে ভরে ওঠে ওদের আবাসন। কোনও কিছু পাওয়ার আশায় নয়, শুধুমাত্র এদের মুখে একটু হাসি ফোটানোর জন্যই সব কাজ ফেলে ওদের কাছে ছুটে যান তিনি। এরা কেউই বড় গায়ক হবে না ঠিকই, গানকে অনেকটা থেরাপির মতো ব্যবহার করে এই ছেলেদের যদি মূলস্রোতের দিকে এতটুকুও ফেরানো যায়, তবে সেটাই হবে অনেক পাওয়া। আজ যখন প্রায় কারও সময় নেই আর পাঁচজনের জন্য ভাবার, তেমনই এক সময়ে দাঁড়িয়ে সীমাদেবীর এই প্রচেষ্টা একটা উদাহরণ তো বটেই। সমাজেরও এক বিরাট পাওনা। টানা দেড় বছর তিনি জড়িয়ে আছেন এদের সঙ্গে। অনেকে এসেছেন, চলেও গিয়েছেন। কিন্তু সীমাদেবী রয়ে গিয়েছেন এক অমোঘ টানে। জড়িয়ে গিয়েছেন ওদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে। কখনও ওদের দুঃখে কেঁদেছেন, কখনও বা মেতে উঠেছেন ওদের আনন্দে। ১৪ নভেম্বর শিশু দিবসে পালন করেছেন ওদের জন্মদিন, অবশ্যই অন্যদের সহায়তায়। নিজের গান ও এই ছেলেদের নিজস্ব ভাষায় জানা গান দিয়ে সাজানো কোলাজে ভরিয়ে তুলেছেন নানা অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় অতিথিদের মন। ইচ্ছে হয় ওদের নিয়ে আরও বেশি অনুষ্ঠান করার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রয়েছে কিছু সরকারি বাধা। তবু তিনি হার মানেন না। ওদের শেখান নিজের মনের তাগিদে। এক সময়ের চুল না আঁচড়ানো, নোংরা জামাকাপড় পরা ছেলেগুলো আজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে ম্যামের কাছে আসে। আনতে ভোলে না ওদের গানের খাতাও। অংশগ্রহণ করে ওদের স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও। সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠে, 'বরিষ ধরা-মাঝে শান্তির বারি... জয় জয় হোক তোমারি।'

হ্যাঁ, জয় একদিন হবেই। একদিন সীমাদেবীর শেখানো গানে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওরা অন্য পাঁচজনের মতো সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। হয়ত সে দিন আর কেউ ওদের আলাদা চোখে দেখবে না! সীমা চৌধুরীর মতো আমরাও স্বপ্ন দেখি, আগাছা নির্মূল হোক, বিকশিত হোক শত শত ফুল।

শ্বেতা সরখেল

খাদ্যমেলা

পকোড়া, বেগুনি, ঘুগনি থেকে শুরু করে বিরিয়ানি, পায়েস, পুলিপিঠে। তালিকাটি অনেক লম্বা করা যেত, যদি সব নাম সঠিক জানা থাকত। তবে স্বাদে-গন্ধে সেগুলির যে কোনও তুলনা চলে না তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বভাবতই আমার মতো সব পেটুকই সেখানে ভিড় জমিয়েছিল। শুধু পেটুকদের কথাই বা বলি কীভাবে? জলপাইগুড়ির এমন কারও কথা কি বলা যাবে, যে নাকি সেইসব খাবারের গন্ধে সেখানে হাজির হয়নি? আর হবে না-ই বা কেন? খাবারগুলি দেখে যতটা লোভ হয়, ততটাই জল আসে জিবে। এর জন্য পুরো কৃতিত্বটাই প্রাপ্য আহেলি, মুক্তি, মিষ্টি, তুলিকা, সোনালি, আবির্ভাব এমনই পনেরোটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের।

গত ২০, ২১, ২২ ডিসেম্বর ২০১৫ জলপাইগুড়ি শহরের ১৯ নং ওয়ার্ডে ছিল খাদ্যমেলা। অভিনব এই মেলায় মানুষের ভিড় দেখে তো উদ্যোক্তারাই অবাক। যেন ঢল নেমেছে নানান স্বাদের খাবার চেখে দেখতে। খাবারদাবারে উৎসাহ কম এমন মানুষ তো খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ফলে স্টলগুলোতে ছিল উপচে পড়া ভিড়। কেউ চেটেপুটে খাচ্ছে, কেউ কী কী দিয়ে কীভাবে তৈরি, সেসব জানতে চাইছে। সব মিলিয়ে দারুণ একটা জমজমাট পরিবেশ। ওয়ার্ডের কাউন্সিলর লোপামুদ্রা অধিকারীর উদ্যোগেই মূলত মেলাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। উৎসব কমিটিতে মূল দায়িত্বে ছিলেন সুনীল বিশ্বাস, সুরজিৎ চাকী, রানা রায়, সুমিত সাহা, প্রদীপ সরকার, চিন্ময় সেন, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিন দিন ধরে মেলা প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে গোটা এলাকাই যে এক মন মাতানো আবহাওয়া পেয়েছিল তা বলার অবকাশ রাখে না। খাদ্যমেলা মানেই যে তাতে কেবল খাবারের আয়োজন তা নয়, ক্রেতাদের ও দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য ছিল একটি মঞ্চ, যেখানে তিন দিন ধরেই চলেছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিনে প্রেস ক্লাব অফ নর্থ বেঙ্গলের তরফ থেকে পুরস্কার দেওয়া হল 'সোনালি' এবং 'আবির্ভাব' স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে। পুরস্কারের উদ্দেশ্য ছিল, মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহিত করা, যাতে তারা সকলেই আগামী দিনে প্রতিযোগিতার মানসিকতা নিয়ে নিজেদের কাজ গুরুত্ব সহকারে পালন করে।

আপনার এলাকায় এই ধরনের কোনও উৎসব-অনুষ্ঠান থাকলে প্রতিবেদন পাঠান ছবিসহ এই ঠিকানায়— 'শ্রীমতী ডুয়ার্স', প্রযত্নে 'এখন ডুয়ার্স', মুক্তা ভবন (দোতলা), মার্চেন্ট রোড, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১। ই-মেল- srimati.dooars@gmail.com

EKHON DUARS, Vol-2, Issue-10/2, WBBEN/2014/56733, Rs. 12 Only

অন লাইনে প্রাপ্তিস্থান www.boimela.in

রংরুটের বই। কলকাতা বইমেলায় আমাদের স্টল নং ১৯৭

মূল্য ১৫০ টাকা

মূল্য ১৫০ টাকা

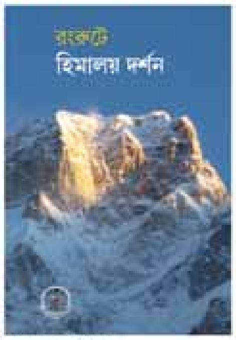

মূল্য ২০০ টাকা

মূল্য ১০০ টাকা

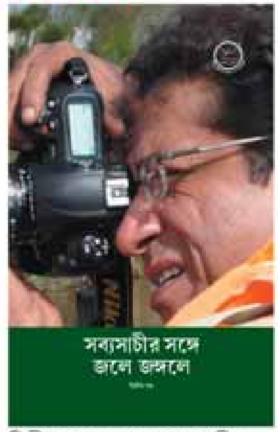

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে সব্যসাচীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গল ও আফ্রিকার দুই দেশ, কেনিয়া ও তানজানিয়া ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

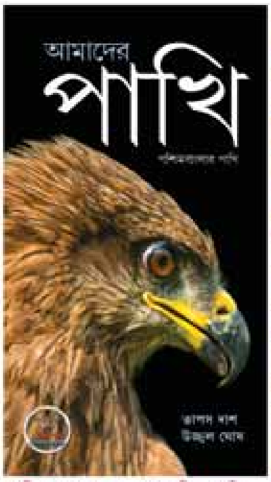

পশ্চিমবাংলার ৩৬০ প্রজাতির পাখির সচিত্র বিবরণ। হার্ডবোর্ড বাঁধাই। ৫০০ পৃষ্ঠা। আগাগোড়া রঙিন। বিদেশি আর্ট পেপারে ছাপা। মূল্য ১০০০ টাকা।

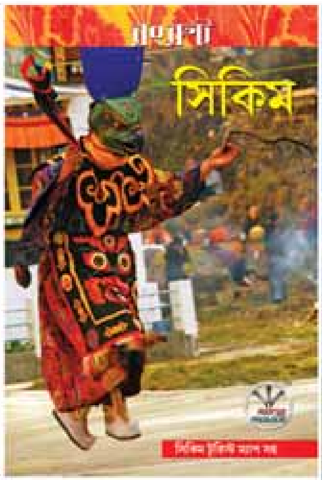

দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ। হার্ডবোর্ড বাঁধাই। মূল্য ২০০ টাকা

দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড়ের নানা প্রত্যন্তে ঘুরে বেড়াবার গাইড। মূল্য ২০০ টাকা

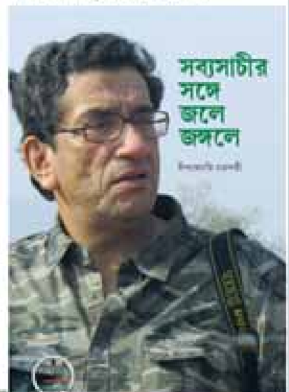

সব্যসাচী চক্রবর্তীর সঙ্গে দেশের নানা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার কাহিনি। মূল্য ১৫০ টাকা

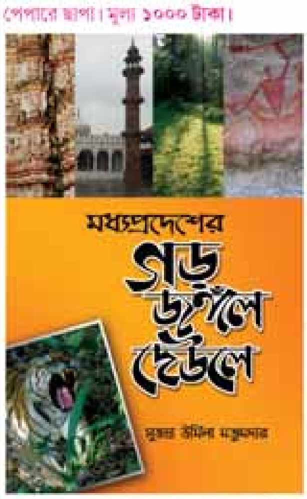

মধ্যপ্রদেশ বেড়াবার একমাত্র বাংলা গাইড
সুভদ্রা উর্মিলা মজুমদার।
মূল্য ২০০ টাকা।

আমেরিকা বেড়াবার একমাত্র গাইড
শান্তনু মাইতি। মূল্য ১২০ টাকা

সুন্দরবন বেড়াতে যাওয়ার আগে এই বই প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। মূল্য ১৫০ টাকা

মূল্য ৯০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান অক্সফোর্ড ১৫ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা ১৬, দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, স্টারমার্ক-এর সবকটি শোরুমে, বোলপুর শান্তিনিকেতন সুবর্ণরেখা, শিলিগুড়ি ইকনমি বুক স্টল কলেজ রোড, জলপাইগুড়ি ভবদার দোকান, কমার্স কলেজের উলটো দিকে কোচবিহার অ্যালফাবেট স্টুডেন্ট হেলথ হোমের উলটো দিকে, আলিপুরদুয়ার ম্যাগাজিন সেন্টার কলেজ হল্ট, আলিপুরদুয়ার কোর্ট।

PRINTER & PUBLISHER : PRADOSH RANJAN SAHA. On behalf of owner Mr. Pradosh Ranjan Saha, printed at Albatross Graphic Solution Pvt. Ltd., published at 18/7 Dover Lane, Kolkata 700029, Editor - Pradosh Ranjan Saha.